প্রথম অধ্যায়

শিল্পায়ন নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকার বড় পুঁজির উপরে নির্ভর করে শিল্পায়নের যে পথ অনুসরণ করছেন তাতে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

এই বিতর্ক চালাতে গিয়ে একটা বড় সমস্যা দেখা যায়। সরকারী পথের স্বপক্ষে বলা হচ্ছে যে এখন কৃষিজমির অংশ থেকে শুরু করে বড় পুঁজি যা চায় তাই দিতে হবে, তবে ভবিষ্যতে শিল্পায়ন হবে নচেৎ একেবারেই হবে না।

ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে তর্ক করা মুস্কিল। কারণ প্রমাণের উপায় নেই। যাঁরা সরকারকে বিশ্বাস করেন তাঁরা ভবিষ্যতের গল্পও বিশ্বাস করবেন, আর বিপক্ষের লোকেরা জানাবেন ঘোরতর অবিশ্বাস, বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে গেলে বিতর্ক নিষ্ফলা হয়ে যায়।

চীনে এই পথে শিল্পায়নের ক্রিয়াকলাপ চলছে কুড়ি বছরের উপর। চীনের এই শিল্পায়ন নিয়ে সরকারী মহল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তা হলে চীনে কী হয়েছে তা অনুপুঙ্খভাবে দেখলে

শিল্পায়নঃ রূপকথা আর বাস্তব

দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

ক্যাম্প, ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০৭৩
মে,২০০৭

লেখকের কথা

আমি অর্থনীতির ছাত্র নই। কিন্তু অনেকের মত আমিও দেখছি আমাদের পশ্চিম বাংলায় দেশিবিদেশি বৃহৎ পুঁজির আক্রমণে মানুষের জীবনজীবিকা বিপন্ন। কৃষক জানে না কখন তার জমি অধিগ্রহণের তালিকায় চলে আসবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বা ছোট শিল্পের শ্রমিক জানে না কবে কারখানার গেটে ওয়ার্ক সাসপেনসন নোটিস ঝুলবে। সরকারী কর্মচারী দেখছে যে নীট হিসাবে কর্মসঙ্কোচন চলছে। ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, ফেরিওয়ালা জানে না কবে রিলায়েন্স বা ওয়াল-মার্ট তার সামান্য বিক্রিবাটায় থাবা বসাবে।

বিশাল কারখানা বসছে কিন্তু চাকরি হচ্ছে অল্প ক'জনের। ছাত্রছাত্রী, বেকার যুবা, কৃষকের সন্তান, সবাইকে এই ক'টি চাকরির সেই একই কুমীরছানা দেখানো হচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, যদিও এই ক'টি চাকরি আমাদের বেড়ে চলা বেকারসংখ্যার তুলনায় নগন্য।

আর বৃহৎ পুঁজির আক্রমণের বিপক্ষে দাঁড়ালে মানুষকে নৃশংস অত্যাচারের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এই পুস্তিকায় তাই অনেকের সঙ্গে আমি চেষ্টা করেছি এই আক্রমণের অর্থনৈতিক মর্মবস্তুটি বুঝতে। তা ছাড়া মার্কিন 'উদারীকরণ' ও 'বিশ্বায়নের' প্রচারক অর্থনৈতিক পণ্ডিতরা, সাংবাদিক ও লেখক-শিল্পীরা নৃশংসতার জন্য একটু কেঁদে নিয়েই চোখ মুছে বলছেন, 'কিন্তু কী করা যাবে, বিকল্প নেই'।পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেই বিকল্প যে থাকতে পারে সে বিষয়েও কিছু দিকনির্দেশকের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস আছে পুস্তিকাটিতে।

অবশ্য এই ধরণের সামান্য বিকল্প সামনে নিয়ে এগোতে গেলেও দেশিবিদেশি বড় পুঁজির সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য।

ইন্টারনেট সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৭

ঢাক পিটিয়ে বলি না কেন শিল্পায়ন হচ্ছে, যার হাতে কাজ নেই, ঘরে ভাত নেই সে বলবে শিল্পায়ন না ছাই!

অর্থাৎ কত লাখ বা কোটি টাকা বিনিয়োগ হল তা নয়, বিনিয়োগের লাখ টাকা অথবা কোটি টাকা পিছু ক'টা চাকরি হল সেটাই আসলে দেখার জিনিস।

প্রতি বছর আরও নতুন মানুষ কাজ খুঁজতে ঢুকছেন কাজের বাজারে। যদি খুব সরলীকরণ করে ধরি ১৬ বছর বয়স হলে কাজের বাজারে কেউ এসে ঢোকেন আর ৬৫ বছর বয়স হলে কাজের বাজার থেকে অবসর নেন তা হলে ১৬-৬৫ বছর বয়সের মধ্যে মানুষের সংখ্যা কত বাড়ল তা নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যার একটা মোটা হিসাব দেবে। আসলে এই হিসাবের চেয়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা আরও বেশি। যেমন, যাদের এই বছরে চাকরি গেল তাঁরা তো এই হিসাবে এলেন না।

এবার দেখতে হবে বিনিয়োগের ফলে যে নতুন চাকরি তৈরি হল কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় তার সংখ্যা কেমন। যদি কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তার চেয়ে কম হারে নতুন চাকরি তৈরি হয় তবে বছর বছর বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এমন বিনিয়োগ দিয়ে কী হবে? তখন ভাবতে হবে কেমন বিনিয়োগে প্রতি লাখ টাকা বিনিয়োগের ফলে আরও বেশি চাকরি তৈরি হবে।

এই মাপকাঠিতে চীনের সাম্প্রতিক বিনিয়োগের রমরমাকে বিচার করা যাক।

বিনিয়োগের রমরমা[১]

বিনিয়োগের যে অংশ উৎপাদনে সরাসরি ব্যবহৃত হয় সেই স্থাবর সম্পদের ওপর নজর রাখা যাক। স্থাবর সম্পদ বলতে

আমাদের ভবিষ্যৎ সত্যিই সরকারী প্রচারে যা বলা হচ্ছে তেমন উজ্জ্বল কি না নির্ধারণ করা যেতে পারে। কারণ এখানে যা ভবিষ্যৎ চীনে তা বর্তমান।

প্রথমে তাই আমরা চীনের সাম্প্রতিক শিল্পায়নের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে চর্চা করব।

চীনের শিল্পায়নের থেকে শিখতে হবে

১৯৭৯-৮০ সালের আগে চীনে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল না বললেই চলে। তারপর দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য নানা সুবিধা দেওয়া শুরু হয়। বিদেশি বিনিয়োগ হু হু করে ঢুকতে থাকে। সারা বছরে বিভিন্ন উদ্যোগে সরাসরি যে বিদেশি বিনিয়োগ ঘটেছে বছর বছর তা যোগ করে দেখা যায় ১৯৮০-২০০০ এই ২০ বছরে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ২০০ গুণ বেড়েছে (২)।

এস.ই.জেড. কী?

বিনিয়োগকারী, বিশেষতঃ বিদেশি বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করার জন্য এক একটি এলাকা তাকে দেওয়া হচ্ছে যেখানে দেশে চালু আছে যে শ্রম আইন, কর ও শুল্ক, অথবা পুঁজির কাঠামো'র ওপর রয়েছে যে নিয়ন্ত্রণ (যেমন মালিকানার কত অংশ বিদেশি হাতে থাকতে পারবে তার নিয়ম), এ সবের থেকেই ছাড় পাওয়া যাবে। এই এলাকার নাম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, এস.ই.জেড.।

১৯৮০ সালে চীনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ৪টি এস.ই.জেড. খোলা হয়। শাংহাই'এর আশেপাশে আবির্ভূত হয় আরও এস.ই.জেড.। এগুলি ছিল গোটা শহর বা প্রদেশ জুড়ে। ১৯৮৪ থেকে ছোট ছোট এলাকায় এস.ই.জেড. ধরণের বিশেষ সুবিধা দেওয়া শুরু হয়। এদের নাম জাতীয় অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিকাশ অঞ্চল এন.ই.টি.ডি.জেড। ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের ভিতরে এ রকম ৫৪টি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল (৩)।

কেমন সুবিধা দেওয়া হয়? আয়করের উদাহরণ নেওয়া যাক। চীনে কর্পোরেট সংস্থার আয়কর ৩৩% (৪)। সেখানে এস.ই.জেড.'এ প্রথম ২ বছর কর নেই, তারপর ৩ বছর ধরে করের হার ৭.৫%, ৫ বছরের পর থেকে করের হার ১৫% (৫)। এ ছাড়া ভ্যাট ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কাস্টমস শুল্কে ছাড় আছে।

- বিদেশি পুঁজি আকৃষ্ট করা ও ঐ পুঁজি ব্যবহার করে প্রকল্প গড়ে তোলাই হল এস.ই.জেড. এলাকার মূল প্রচেষ্টা।
- প্রথম দিকে বিদেশি সংস্থাকে চীনা সংস্থার সঙ্গে যৌথ মালিকানায় ব্যবসা করতে অথবা কোনো চীনা সংস্থাকে অংশীদার হিসাবে নিতে বাধ্য করা হত। এখন ১০০% বিদেশি মালিকানা রাখার অনুমতি পাওয়া যায়।
- রপ্তানির লক্ষ্য মাথায় রেখে মাল তৈরি করা হয়।
- এস.ই.জেড. এলাকার কাজকর্ম চলে বাজার অর্থনীতি অনুযায়ী। কোনো কোনো এলাকার নিজস্ব স্টক এক্সচেঞ্জও আছে।

এস.ই.জেড. অঞ্চলের স্থানীয় সংসদ ও প্রশাসনকে নিজের এলাকার মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। ৫৪টি ই.টি.ডি.জেড. ছড়িয়ে আছে মোট ৪০০/৫০০ বর্গ কিলোমিটার

জায়গায়, কিন্তু দেশের মোট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ১৫%(৩) রয়েছে এখানে। আর একটি হিসাব অনুযায়ী মোট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ২০% এস.ই.জেড. এলাকায় কেন্দ্রীভূত (৬)। চীনের মোট রপ্তানির ২৩%'ই যায় এস.ই.জেড. থেকে (৬)। ফলে এই বিশেষ অঞ্চলগুলি চীনের অর্থনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিশেষ এলাকাগুলির বৃদ্ধির হারও বেশি। মোট উৎপন্ন জি.ডি.পি., শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, শিল্পদ্রব্যে যুক্ত মূল্য (ভ্যালু অ্যাডেড), কর বাবদ রাজস্ব, বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য (যার ৫১%ই আসছে রপ্তানি থেকে), চুক্তিবদ্ধ বিদেশি বিনিয়োগ, ব্যবহৃত বিদেশি বিনিয়োগ, এই সব সূচকই হালে জাতীয় হারের চেয়ে ১০-২০% বেশি হারে বেড়েছে (৩)।

বিনিয়োগ মানেই কি শিল্পায়ন?

কাগজে পত্রে, প্রচার মাধ্যমে একটা ধারণা ভেসে বেড়াচ্ছে যে বিনিয়োগ বাড়া মানেই শিল্পায়ন। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাগজ খাওয়া যায়, না কল কব্জা? ইস্পাত, গাড়ি, রাসায়নিক কেমিকাল কোনোটাতেই পেট ভরবে না। বিনিয়োগের ফলে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় কাজ বাড়ে তবেই লোকের হাতে আসবে বেতনের পয়সা, কর্মসংস্থান হলে তবেই বাড়বে ক্রয়ক্ষমতা।

তা হলে বিনিয়োগের জন্যই বিনিয়োগ নয়, চীন ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে, যেখানে অসংখ্য লোকের হাতে কাজ নেই, সেখানে বিনিয়োগের আসল লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান। যদি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেকার সংখ্যাও বাড়তে থাকে, তবে যতই

মালিকানার বড় উদ্যোগে ১.৬ কোটি চাকরি বাড়ে, এ ছাড়া ছোট শিল্পে ও স্বনিযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগে চাকরি বাড়ে ২ কোটি। ফলে ২.৩ কোটি নিয়মিত চাকরি নীট কমে যায় এই নতুন শিল্পায়ন নীতির কল্যাণে (১০)।

সাম্প্রতিক ছবিটা কী?

২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে দেশী বিদেশী বেসরকারী প্রকল্পে চাকরি বেড়েছে ৬০ লাখ (১)। কিন্তু জনসংখ্যাও বেড়েছে।

বেসরকারী উদ্যোগের বিপুল বিনিয়োগ কি যথেষ্ট নতুন চাকরি তৈরি করতে পারছে?

২০০৪ সালে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়েসের শহরের মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৯ কোটি। এঁদের ধরা হয় কর্মক্ষম বলে। সরকারী বেসরকারী সমস্ত ক্ষেত্র মিলিয়ে কর্মসংস্থান ছিল শহরের কেবল ২৬ কোটি মানুষের। বাকি ১৩ কোটি কর্মক্ষম মানুষের নির্দিষ্ট কাজ ছিল না। ২০ বছর ধরে বৃহৎ পুঁজির ওপর ভিত্তি করে শিল্পায়নের পর এমনই দাঁড়িয়েছে বেকারীর হাল।(১)

২০০৪ সালে মোট জনসংখ্যার ৭২% মানুষ ছিলেন ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়েসের মধ্যে। আর ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা বেড়েছিল প্রায় ২ কোটি। তাহলে মোটা হিসাব বলে শহরাঞ্চলে এই এক বছরে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দেড় কোটির মত বেড়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় দেশি বিদেশি বেসরকারী ক্ষেত্রে ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে যে ৬০ লাখ কাজ তৈরি হয় প্রয়োজনের তুলনায় তা কতই অপ্রতুল।(১)

সরকারী মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন উদ্যোগে চাকরি? শহরের সরকারী ও যৌথ প্রকল্পে কর্মচারীর সংখ্যা এই এক বছরে ৩% কমে যায়। সংখ্যায় কমে যায় ২৫ লাখ।(১)

বোঝায় জমি, বাড়ি, মেশিন, উৎপাদনের নানা সরঞ্জাম, পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি দলিলে নথিবদ্ধ উৎপাদনের প্রণালী, অফিসের সরঞ্জাম।

স্থাবর সম্পদে বিদেশি বিনিয়োগ বছর বছর বেড়েছে। বিদেশি বিনিয়োগপুষ্ট উদ্যোগে স্থাবর সম্পদের বছরকার গড় নীট মূল্য ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ৯০% বেড়েছে, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগপুষ্ট উদ্যোগের সংখ্যা বেড়েছে ৬২%।

প্রতি বছর স্থাবর সম্পদে মোট যে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে তার দিকে তাকানো যাক। ২০০৩ থেকে ২০০৪'য়ে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬.৬% বেড়েছে । দেশিবিদেশি বেসরকারী খাতে বেড়েছে ৪০%, বিদেশি খাতে বাড়ার হারই ৫৩%(হংকং, তাইওয়ান, ম্যাকাও থেকে আসা বিনিয়োগকেও এখানে বিদেশি বলে ধরা হয়েছে)।

এই পুরো সময় ধরে বেসরকারীকরণ চলেছে। সরকারী মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে আছে এমন উদ্যোগের সংখ্যা ১৯৯৮ থেকে কমতে কমতে ২০০৪ সালের মধ্যে ১৯৯৮ সালে যা ছিল তার অর্ধেকেরও কম হয়ে যায়। এই কয়েক বছরে এ ধরণের উদ্যোগের সংখ্যা ৩৩ হাজার কমে যায়। ৩৩ হাজার সরকারী উদ্যোগ উঠে গেল?

সরকারী মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে আছে এমন উদ্যোগের স্থাবর সম্পদের বছরকার গড় নীট মূল্য ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে বাড়ে, কিন্তু বাড়ার হার ৩৯%, অর্থাৎ বিদেশি বিনিয়োগপুষ্ট উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাড়ার হারের অর্ধেকেরও কম। তার ওপর এ'ও মনে রাখা দরকার যে এই সময়ের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির দরুন স্থাবর সম্পদের দামও বেড়েছিল। এই ৬ বছরে

স্থাবর সম্পদের দাম বাড়ার সূচকের মান ৫.৮% বেড়েছিল। তা হলে বাড়ার আসল হার ৩৯%'এরও কম।

বছর বছর শহরের সরকারী ও যৌথ প্রকল্পের স্থাবর সম্পদে নতুন বিনিয়োগের হিসাব করলে দেখা যাবে ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে এই বিনিয়োগ বেড়েছিল মাত্র ১৫%। আসলে বেড়েছিল আরো কম হারে, কেন না মুদ্রাস্ফীতির জন্য ২০০৩ থেকে ২০০৪'এর মধ্যে স্থাবর সম্পদের দাম বাড়ার ফল এই হিসাবে ধরা হয় নি। এই এক বছরে স্থাবর সম্পদের দাম বাড়ার সূচকের মান বেড়েছিল ৩.৩%।

প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি[১]

আধুনিক বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগের নিয়ম হল প্রচুর বিনিয়োগ আর কম লোক। চীনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৯৯১-২০০১ এই এক দশক ধরে বিদেশী প্রকল্পপিছু ডলারে বিনিয়োগের গড় মূল্য ৩ গুণ হয়েছে (২)। অর্থাৎ প্রকল্পের কলেবর বেড়ে চলেছে।

বিদেশি বিনিয়োগপুষ্ট উদ্যোগ পিছু স্থাবর সম্পদের বছরের গড় নীট মূল্য ১৯৯৮তে ছিল ৩১৪ লাখ ইয়ুয়ান। ২০০৪'য়ে এসে এই মূল্য দাঁড়ায় ৩৬৯ লাখ। অর্থাৎ স্থাবর সম্পদের পরিমাপ অনুযায়ী উদ্যোগের সাইজ ৬ বছরে বাড়ে সাড়ে ১৭%।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও উদ্যোগের কলেবরবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সরকারী মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ আছে এমন উদ্যোগ পিছু স্থাবর সম্পদের বছরকার গড় নীট মূল্য বেড়ে প্রায় ৩ গুণ হয়ে যায়। ২০০৪'য়ে উদ্যোগ পিছু স্থাবর সম্পদের গড় নীট মূল্য ছিল ১৩৯৪ লাখ ইয়ুয়ান।

চাকুরির টিমটিম[১]

কিন্তু প্রকল্প যত বড় হচ্ছে তত কম লোক লাগছে। এটা ধরতে গেলে হিসাব করতে হবে ১ লাখ বা ১ কোটি ইয়ুয়ান বিনিয়োগ করলে ক'টা নতুন চাকরি হচ্ছে।

২০০৩ সালে তার আগের বছরের তুলনায় দেশি বিদেশি বেসরকারী স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রতি ১ কোটি ইয়ুয়ান নতুন বিনিয়োগের ফলে গড়ে ৫০টি নতুন চাকরি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে এই একই পরিমাণের বিনিয়োগ তৈরি করতে পেরেছিল মাত্র ৩৩টি চাকুরি। অর্থাৎ প্রকল্পে যত বেশি পুঁজি খাটছে তত কম হচ্ছে বিনিয়োগের একক পিছু চাকরি সৃষ্টির ক্ষমতা। তা হলে এত বড় প্রকল্পের কী দরকার?

বিনিয়োগ যত বাড়বে তত মুনাফা বাড়বে বিনিয়োগকারীর, চটক বাড়বে সরকারের, মিডলম্যান নেতা, আমলার পকেট ভারি হবে। চীনের সরকারী-বেসরকারী যুগ্ম উদ্যোগের পদে তো স্থানীয় সরকারী আধিকারিক ও পার্টিনেতাদের সরাসরিই দেখতে পাওয়া যায়।

বেকারী বেড়েই চলেছে

শহরের কর্মরত মানুষের অনুপাতে শহরের নথিভুক্ত বেকারের অংশ ২০০০ সালে ছিল ২.৬%, ২০০৩'এ এসে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩.১%। তারপর ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালে শহরে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ২৭ লাখ। (১) কিন্তু এই সংখ্যাগুলি থেকে সমস্যার ভয়াবহতা ধরা যাবে না। আরও গভীরে ঢুকতে হবে।

১৯৯৬ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে শহরের সরকারী ও যৌথ উদ্যোগগুলিতে ৫.৯ কোটি চাকরি লোপ পায় -- ৪২.৫% চাকরিই উঠে যায়। নতুন আবির্ভূত নানা ধরণের দেশি বিদেশি ব্যক্তি

হাইলংজিয়াং'এর দাকিং তৈলক্ষেত্র ঃ ৫০ হাজার উদ্বৃত্ত তৈল শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান।

সিচুয়ান প্রদেশের মিয়ানিয়াং, জুলাই ২০০১ ঃ কারখানায় লালবাতি জ্বালার প্রতিবাদে ৪ হাজারের বেশি শ্রমিক রাস্তায় সংঘর্ষে নামেন।

নানচং, মার্চ ২০০১ ঃ বকেয়া বেতন দাবি করে ২০ হাজার বস্ত্র শ্রমিক শহরের সরকারী সভাঘর দখল করেন।

এক তো কারখানা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আর শিল্পের পরিকাঠামো (যেমন হাইওয়ে সড়ক) কেড়ে নিচ্ছে চাষের জমি। তার ওপর চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডব্লু.টি.ও.'তে প্রবেশ করার ফলে চাষে উৎপন্ন মাল বিশ্ব বাজারের অসম প্রতিযোগিতায় পড়ে মার খাচ্ছে। দেশের কৃষিজাত মালকে ৩১.৫% হারে ট্যারিফ শুল্ক দিয়ে চীন সুরক্ষিত রেখেছিল। ডব্লু.টি.ও.'তে যোগ দেওয়ার ফলে এই ট্যারিফ নামিয়ে আনতে হচ্ছে ১৪.৫% হারে (৯)।

এ অবস্থায় কৃষকরাও প্রতিবাদের রাস্তা ধরেছেন। গুয়াংদং (দক্ষিণ), সিচুয়ান, হেবেই(উত্তর) ও হেনান প্রদেশে এ রকম ঘটনা বেশি ঘটেছে (৮)।

রয়টারস সংবাদ সংস্থার কাছে চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রী ২০০৪ সালে স্বীকার করেন যে এ রকম ৭৪ হাজারটি ঘটনায় ১৮ লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন (৭,৮)। ২০০৩ সালে ঘটেছিল ৫৮ হাজার ঘটনা (৭)। ১০ বছরে এ রকম ঘটনার সংখ্যা ৭ গুণ বেড়েছিল (৭)।

বাড়ছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য

মেকি শিল্পায়নের নীট ফল ধনী দরিদ্রের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। চীনা সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের অকাদেমি এই বৈষম্য পরীক্ষা করেছেন জিনি সূচক দিয়ে। আয়ের বিভিন্নতার

সুতরাং নথির বাইরেও রয়েছে লাখ লাখ বেকার মানুষের কাতার। ২০০৪ সালে শহরের নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ৮৩ লাখ। কিন্তু আমরা দেখলাম ঐ সালে কর্মক্ষম নতুন দেড় কোটি মানুষ শহরে কাজ চাইছেন।(১) এ ছাড়া ২০০২ সালেই বলা হচ্ছিল ৪০ লাখ মানুষ সরকারী প্রকল্প থেকে "লে অফ" হয়ে আছেন (৭)। আর ২০০৪ সালে সরকারী ও যৌথ প্রকল্পে আরো ২৫ লাখ চাকরি কমলো।

গ্রামের বেকার

১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে শতকরা ২১% আবাদী জমি চাষের থেকে সরিয়ে দেওয়া হল শিল্প, রাজপথ, এস,ই,জেড'এর কাজে (৮)। ১৯৯২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ২ কোটি মানুষ জমি হারালেন (৭)। ২০০২ সালে চাষের কাজে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ কোটি (৭)।

সব মিলিয়ে ৮ কোটি বেকার মানুষ সারা চীনে চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন (৭)। যেখানে যা কাজ পাচ্ছেন করছেন।

মেকি শিল্পায়নের মানবিক মূল্য[৭]

চীনের এই শিল্পায়নকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে বেকার সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা এর মধ্যে নেই। পশ্চিম বাংলায় প্রায়ই বলা হয় যে কৃষি এত মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারছে না, গ্রামের ছেলেমেয়ে চাষবাস ছেড়ে শিল্পে চাকরি চাইছে, তাই কৃষিজমি কিছুটা চীনা ধাঁচের বড় পুঁজির বিনিয়োগ ভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম এই শিল্পায়ন শহরে যে কর্মপ্রার্থীরা কাজের খোঁজে কাজের বাজারে

ঢুকছেন তাঁদেরই কাজ দিতে পারছে না, কৃষি থেকে উৎপাটিত অথবা গ্রামত্যাগী মানুষকে কোথা থেকে কাজ দেবে? আসলে শিল্পায়নের নামে যে অত্যাচার চলবে তাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এই সব গল্পকথার অবতারণা।

সব কুযুক্তি ব্যর্থ হলে বলা হচ্ছে বেকার সমস্যা না মিটলেও অল্প কিছু কাজ যা বাড়ছে তার কি কোনো মূল্য নেই? মূল্য নেই তা নয়। কিন্তু স্বভাবতই সেই মূল্য বিচার করতে গেলে এই শিল্পায়ন চালু করার জন্য যে মূল্য দিতে হল তাকে তুলতে হবে তুলাদণ্ডের অপর পাত্রে।

উদারীকরণ নীতি অনুসারে চীনে বেসরকারী বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে সরকারী প্রকল্পে লালবাতি জ্বালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু সরকারী উদ্যোগ উঠে গেছে। বেশ কিছু উদ্যোগ বেতন বাকি ফেলেছে। ২০০২ সালের মধ্যে যে ৪০ লাখ শ্রমিক সরকারী উদ্যোগ থেকে 'লে-অফ' হয়েছেন তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি।

চীনের শিল্পে, বিশেষ করে বিদেশি উদ্যোগে শ্রমিকদের অধিকার ঠেকেছে তলানিতে। ন্যূনতম বেতন তো দূরের কথা, কোনো কোনো জায়গায় বেতনের একটা অংশ মালিকের কাছে গচ্ছিত রাখার নিয়মও আছে, যাতে অসহ্য লাগলেও লোক ছেড়ে চলে না যেতে পারে। কোথাও কর্মপ্রাপ্তি বাবদ ঘুষ নিয়ম করে কেটে নেওয়া হয়। ৪০ ঘন্টা কাজের সপ্তাহ তো চলেই, তাইওয়ান বা দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগপুষ্ট উদ্যোগে দিনে ১২ ঘন্টা কাজের খবর আছে। কারখানায় আটকে রেখে দেওয়ার ঘটনাও শোনা গেছে -- একটি কারখানায় ২৭০০ শ্রমিকদের আগলাতে ছিল ১০০ রক্ষী। নজরদারির কাজে কোথাও কোথাও রক্ষীরা কুকুরও ব্যবহার করে।

বেকার মানুষের যে বাহিনী দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের যে কোনো শর্তেই প্রায় কাজে লাগানো যায়। মালিকদের বেজায় সুবিধা। আউটসোর্সিং, কন্ট্র্যাক্ট চুক্তি, অস্থায়ী কন্ট্র্যাক্ট মজুর নিয়োগ, বাড়িতে বসে কাজ, কত রকম পদ্ধতি চলছে চীনে যাতে চিকিৎসা, দুর্ঘটনার দায়িত্ব, অবসর কালে পেনসন ইত্যাদি যে সুবিধাগুলি স্থায়ী শ্রমিকদের ভোগ করার কথা সেগুলিতে ফাঁকি দেওয়া যায়, কারখানার বাড়ি পর্যন্ত হাপিস রাখা যায়, শ্রমিকদের দেখাসাক্ষাৎ রোধ করে তাদের সংগঠিত হওয়া ঠেকিয়ে রাখা যায়।

যাঁরাই শ্রমিকদের সরকারী সংগঠনের বাইরে স্বাধীন সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে থেকেছে কারাবাস, কঠিন শাস্তি, মৃত্যু। ২০০১ সালে জাতিসংঘের আই. এল.ও. সংস্থার ডিরেক্টর-জেনেরাল চীনের শ্রম মন্ত্রীকে ২৪জন শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীর নাম দেন যাঁরা জেলখানায় পচছেন। বলা বাহুল্য ২৪ সংখ্যাটি আসলের চেয়ে অনেক কম।

ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের ৬০% নারী। এঁদের কাজে লাগানো হয় ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে। ৩০ বছর বয়সের পর আর রাখা হয় না, এর মধ্যে তাঁদের ছিবড়ে করার প্রক্রিয়া সমাপ্ত।

শ্রমিক কৃষকের প্রতিরোধ

মানুষ প্রতিবাদ করছেন, প্রতিরোধে নামছেন (৭)।

লিয়াওইয়াং, মে ২০০২ঃ শ্রমিক জনসংখ্যার ২৫% বেকার। একটি সরকারী প্রকল্পের ৫ হাজার ছাঁটাই শ্রমিকের বকেয়া বেতন আদায়ের দাবিতে আন্দোলন হয়। ৮০০ শ্রমিক তাতে সামিল হন।

ফুদান, মে ২০০২ ঃ কয়লাখনি শ্রমিকরা তাঁদের বেকারত্বের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করেন।

(৫) ডব্লু.ডব্লু.ডব্লু. ওয়ার্ল্ডওয়াইড-ট্যাক্স.কম, এপ্রিল ১৭, ২০০৭।
(৬) ফিকি'র সেক্রেটারি-জেনেরাল, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৯শে এপ্রিল, ২০০৬।
(৭) ডঃ দীপক বসু, স্পেশাল ইকনমিক জোনস ইন চাইনা অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, (ইন্টারনেটে প্রকাশিত, ২৮শে জানুয়ারি, ২০০৭)। ডঃ বসু জাপানের নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অধ্যাপক।
(৮) ভাস্কর গোস্বামী, এস.ই.জেড.'স, লেসনস ফ্রম চাইনা, (ইন্টারনেটে প্রকাশিত, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭)। শ্রী গোস্বামী নয়া দিল্লির ফোরাম ফর বায়োটেকনোলজি অ্যাণ্ড ফুড সিকিউরিটি'র সঙ্গে যুক্ত।
(৯) কে.সি.ফুং, এইচ আইজাকা, এস. টং, ২৪-২৫ জুন, ২০০২ তারিখে হংকং'য়ে "একবিংশ শতাব্দীতে চীনের অর্থনীতি" শীর্ষক সম্মেলনের প্রস্তুতিপত্র (ইন্টারনেটে প্রকাশিত)।
(১০) অজিত কে. ঘোষ, সিনিয়র ইকনমিস্ট, এমপ্লয়মেন্ট এ্যানালিসিস ইয়ুনিট, এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটিজিস বিভাগ, আই.এল.ও., এমপ্লয়মেন্ট ইন চাইনা, রিসেন্ট ট্রেণ্ডস অ্যাণ্ড ফিয়ুচার চ্যালেঞ্জেস, এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটিজি পেপারস ২০০৫/১৪।
(১১) এসিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক, ২০০৬, পিপলস রিপাব্লিক অফ চাইনা ।

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলাফল জিনি সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এটি একটি ভগ্নাংশ যার মান ০ আর ১'য়ের মধ্যে থাকে। ভগ্নাংশটি যত বড় হবে আয়ের বৈষম্য তত বেশি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মার্কিন দেশের ক্ষেত্রে জিনি সূচকের মান ০.৪১, ভারতের ক্ষেত্রে ০.৩৩। সেখানে চীনের জিনি সূচক ২০০৬ সালে ছিল ০.৫০ (৮)।

সুবুদ্ধির উদয়?[১]

মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের কিছু ফল ফলছে।

২০০৪ সালের এপ্রিলে চীনের স্টেট কাউন্সিল চাষের জমি অন্য কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে। কৃষিমন্ত্রী দু কুইংলিং প্রতিশ্রুতি দেন যে মৌলিক কৃষিজমির বিস্তার কমানো হবে না, ঐ জমি চাষ ছাড়া অন্য কাজে সরানো হবে না, ঐ জমির উৎকর্ষ যাতে কমে যায় এমন কিছু করা হবে না। (৮)

২০০৪ সালে ৯০ কোটি কৃষকের মধ্যে ৬০ কোটি কৃষককে সরাসরি ভরতুকি হিসাবে দেড়শ কোটি মার্কিন ডলার দেওয়া হয়। ঐ বছর ৮ কোটির বেশি কৃষক সমবায়ভিত্তিক চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় আসেন। ৫ কোটির বেশি কৃষক গ্রামীণ বার্ধক্যবীমার আচ্ছাদনে আসেন এবং ২০০৫ সালে ২২ লাখ কৃষক পেনশন লাভ করেন। সওয়া এক কোটির বেশি গ্রামীণ অভাবী মানুষ ঐ বছরে জীবনধারণের ন্যূনতম মানের গ্যারান্টি ভাতা গ্রহণ করেন। (৮)

২০০৫ সালেই খাদ্যশস্যের বিক্রয়মূল্য ৬০% বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে কৃষিক্ষেত্রে আয়কর তুলে দেওয়া হয় আর

খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভর্তুকির পরিমাণ ১০% বাড়িয়ে দেওয়া হয়। (৮)

বিনিয়োগ সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বাড়ছে না, এতে চীনা কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। চীনের জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন হিসাব করেছেন ২০০৬ সালে ৯০ লাখ নতুন কর্মপ্রার্থী (এঁদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ৩০ লাখ) শহরের কাজের বাজারে ঢুকবেন। ১৩০ লাখ সরকারী উদ্যোগ থেকে উদ্বৃত্ত ঘোষিত হবেন। ৩০ লাখ ভবঘুরে শ্রমিক এসে পৌঁছাবেন। এই আড়াই কোটি বাড়তি কর্মপ্রার্থীর জন্য তৈরি হবে কেবল এক কোটি দশ লক্ষ চাকরি। বেকার বাহিনীতে নাম লেখাবেন আরও এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ। (১১)

একাদশ পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রারম্ভেই তিনটি কাঠামোগত দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন চীনা কর্তৃপক্ষ ঃ শিল্পে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে, আয়ের বৈষম্য এবং শহরের তুলনায় গ্রামের আয়ের ঘাটতি ঘটছে, পরিবেশের প্রতি যথেষ্ট নজর পড়ে নি। (১১)

বিনিয়োগ বাড়ার হার একটু কমেছে। ২০০২ থেকে ২০০৩ সালে স্থাবর সম্পদ বাড়ে ২৭.৭% হারে। তারপর ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালে আমরা দেখেছি এই হার দাঁড়িয়েছিল ২৬.৬%। ২০০৪ থেকে ২০০৫ সালে স্থাবর সম্পদ বাড়ে ২৫%, ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালে বাড়ার হার হয়েছে ২৪%, শহরে স্থাবর সম্পদ বেড়েছে ২৪.৫% হারে।

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের বাস্তবে ব্যবহৃত মূল্য ২০০৫ থেকে ২০০৬তে ৪.১% কমেছে, এই এক বছরে যতগুলি সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের চুক্তি হয়েছে তা আগের এক বছরের তুলনায় ৫.৮% কম ।

বিনিয়োগে যেমন রাশ ধরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, বোঝাই যায় বিশেষ নজর পড়েছে কর্মসংস্থানেও। ২০০৬ সালে মোট জনসংখ্যার যত মানুষ কর্মক্ষম (অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মধ্যে) আর মোট জনসংখ্যার যে ভগ্নাংশ শহরের বাসিন্দা, এই দুই সংখ্যা থেকে হিসাব করা যায় যে শহরে এই বছরে ৪১.৭ কোটি মানুষ কর্মক্ষম ছিলেন। আর শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান ছিল ২৮.৩ কোটি মানুষের, অর্থাৎ শহরের ১৩.৪ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান ছিল না। স্বস্তির কথা, ২০০৪ সালের তুলনায় এই সংখ্যা বাড়ে নি বললেই চলে। এমনিতে শহরে নথিভুক্ত বেকারীর ঘোষিত হার ২০০৫'য়ে ছিল ৪.২%, ২০০৬'য়ে তা কমে হয় ৪.১%। (এখানে উল্লেখ করা যায় যে ২০০০ সালে সারা দেশে বেকারত্বের ঘোষিত হার ছিল ৩%, বাড়তে বাড়তে ২০০২'তে হয় ৫.২%। ২০০৩'য়ে ছিল ৫% আর ২০০৪ থেকেই একটু কমার লক্ষণ দেখা যায়, ২০০৪'য়ে ছিল ৪.৪%।)

সূত্রঃ

কোনো সূত্রের উল্লেখ না থাকলে সূত্র (১) দ্রষ্টব্য।

(১) পিপলস রিপাব্লিক অফ চাইনা'র ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স।

(২) ফরেন ইকনমিক স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ারবুক, চাইনা স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ারবুক, বিভিন্ন সংখ্যা (উদ্ধৃত -- ৯)।

(৩) মুম্বই'তে পিপলস রিপাব্লিক অফ চাইনা'র কনসাল জেনেরাল, "এস.ই.জেডঃ মহারাষ্ট্রের বৃদ্ধির চালক" কনফারেন্সে বক্তৃতা, ৫ই জুন, ২০০৬।

(৪) প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস, হংকং হোম, (ইন্টারনেট),৮ই মে, ২০০৭।

পশ্চিমবঙ্গ ২ বছর আগে যা ভেবেছিল সেই সূত্রগুলিই ২০০৫'এর আইনে দেখা যাচ্ছে (২)।

- কেন্দ্র চেয়েছিল পুঁজিপতিরা জমি মালিকের কাছ থেকে সরাসরি কিনে নিক। পঃবাংলার সরকার ও প্রধান শাসক দল চাপ দিচ্ছে যাতে রাজ্য সরকার পুঁজিপতির হয়ে জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। কারণ নাকি দালালদের হাত থেকে জমির মালিককে বাঁচানো। কিন্তু সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, কলিঙ্গনগর আসল কারণটা পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। জমির মালিক বিক্রি ক'রতে না চাইলে পুঁজিপতি অসহায়। কিন্তু সরকারের আছে জমি অধিগ্রহণের অস্ত্র, পুলিস, দলের আছে সশস্ত্র বাহিনী। পুঁজিপতির জমি পাওয়া নিশ্চিত করতেই পঃবাংলার সরকার ও প্রধান শাসক দলের এই চাপাচাপি।

- কেন্দ্রীয় আইনে অন্যান্য কর ও শুল্কের পাশাপাশি মুনাফার উপর যে আয়কর বসে এস.ই.জেড. অঞ্চলে প্রথম ৫ বছর তাতে পুরো ১০০% ছাড় থাকবে, পরের ৫ বছর থাকবে ৫০% ছাড়। পঃ বাংলার প্রধান শাসক দল ১০ বছরটা ২ বছরে নামাবার সুপারিশ করে। কিন্তু কেন্দ্র রাজি না হ'লে আর চাপাচাপি করে নি। তাদের ২০০৩'এর চিন্তায় ছাড়ের সময়সীমার কথাই ছিল না, ফ'লে তাদের দুর্বল গলার সুপারিশকে যদি লোকদেখানো বলি তা হলে খুব ভুল বলব কি?

এঁরা চুপ, কিন্তু এই ছাড় নিয়ে ক্রমাগত সমালোচনা হচ্ছে। কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রক হিসাব করেছে এই কর ছাড়ের ফলে ২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যে ১,০২,৬২১ কোটি টাকার রাজস্ব লোকসান হবে (২)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
হাতে হাতে কাজ দেবে এমন শিল্পায়ন চাই

বড় পুঁজির বড় বিনিয়োগের কর্মসংস্থানহীন 'শিল্পায়নের' যে বিষফল ফলেছে চীনে তারই বিষবৃক্ষ রোপণ চলছে পঃ বাংলায়। ইতিমধ্যেই ফল ফলছে। রক্তস্রোত বইছে নন্দীগ্রামে। পঃ বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম সরকারী পুলিস এবং সরকারের প্রধান শরিকদল্লের বন্দুকধারী বাহিনী জমি ছাড়তে অনিচ্ছুক কৃষকের উপর চড়াও হল কোনো এক বিদেশি পুঁজিপতির স্বার্থরক্ষায়।

এই অধ্যায়ে আমাদের দেশে ও বিশেষ করে পঃ বাংলায় চেপে বসছে বড় পুঁজিনির্ভর যে 'শিল্পায়ন' তাকে আমরা লক্ষ্য করব চাকরি সৃষ্টির নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে।

পশ্চিম বাংলায় এস.ই.জেড'এর চিন্তাঃ ২০০৩

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এস.ই.জেড বিল প্রণয়ন করেছিলেন (১)। তাঁদের চিন্তার ধরণ এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

- এস.ই.জেড অঞ্চলে কোনো উদ্যোগ স্থাপনা বা চালনার জন্য যে অনুমোদন, অনুমতি, মতদান, ছাড়পত্র, লাইসেন্স লাগবে তা ওই অঞ্চলের উন্নয়ন কমিশনার নিজেই দিতে পারবেন।

কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও এস.ই.জেড'এর বাইরের উদ্যোগীরা লাল ফিতার বাঁধন কাটার 'এক জানালা' নামক এই সাধু প্রচেষ্টার সুবিধা পাচ্ছেন না।

- শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্প বিরোধে মধ্যস্থতার ক্ষমতা অঞ্চল কমিশনারের।

- শ্রম আইন প্রয়োগের অধিকারও অঞ্চল কমিশনারের।

মালিকের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে শ্রম দপ্তরে নালিশ, ট্রাইবুনাল ইত্যাদি শ্রমিকপক্ষের যে যৎসামান্য আইনী রক্ষাকবচ ছিল তা'ও উঠে গেল আর কি।

- এস.ই.জেড'এর উদ্যোগগুলিকে সাধারণের আবশ্যিক পরিষেবা বলে ধরা হবে।

ধর্মঘটের অধিকার চলে গেল। আন্দোলনই করতে দেবে না।

- এস.ই.জেড. অঞ্চলে আমদানি বা রপ্তানি, অঞ্চলের উদ্যোগের মধ্যে বেচাকেনা, দুটি এস.ই.জেড. অঞ্চলের মধ্যে বেচাকেনা, অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদন ও অন্য প্রক্রিয়ায় মালের মূল্যবৃদ্ধি, এস.ই.জেড. অঞ্চল থেকে দেশের অন্যত্র পাঠিয়ে মালের মূল্যবৃদ্ধি প্রক্রিয়া সংঘটিত করে অঞ্চলে ফেরৎ আনা, এই সব প্রক্রিয়ার উপর রাজ্যের আইন অনুযায়ী যে সব কর, শুল্ক, ফি, সেস বা অন্য দেয় সাধারণভাবে মোতায়েন হওয়ার কথা, এস.ই.জেড. অঞ্চলের উদ্যোগ সে গুলি থেকে মুক্ত থাকবে।

করমুক্ত অবস্থার কোনো সময়সীমা বলা ছিল না ২০০৩ সালে।

- স্থাবর সম্পত্তি ও সেই সংক্রান্ত দলিলের উপর কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি বা নথিকরণ ফি লাগবে না।

আমার আপনারও এই কর ও ফি দিতে হয়, টাটা, রিলায়েন্স, সালিম, জিন্দলদের দিতে হবে না।

- পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ তার ক্ষমতা এস.ই.জেড. উন্নয়ন কমিশনারের উপর ন্যস্ত করবে।

দূষণের উপর নিয়ন্ত্রণের যে আইনগত বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ছিল তা তাহলে উঠে যাবে।

এস.ই.জেড. অঞ্চলের একজন মূল 'উন্নয়নকারী' পুঁজিপতি থাকবে। এই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এস.ই.জেড'এর মধ্যেকার পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা সরবরাহ করার জন্য পরিষেবা চার্জ ধার্য করবে ও সংগ্রহ করবে।

মানে এক একটি এস.ই.জেড. হবে এক একটি পুঁজিপতির রাজত্ব। সেখানে দেশের আইন চলবে না। স্বাধীন রাজত্ব। রাজা কর আদায় করবেন।

সব চেয়ে আশ্চর্য কথা 'উন্নয়নকারী' ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের সুযোগসুবিধার কথাই বিলটিতে বলা আছে, তাদের কী শর্তে বাছা হবে ও তাদের দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা কী সে সম্বন্ধে কোনো দিকনির্দেশ নেই। এমন কি উদ্যোগকে যে রপ্তানিমুখী হতে হবে তার বাধ্যবাধকতাও নেই।

এস.ই.জেড., ২০০৭

২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এস.ই.জেড আইন চালু করল।

ইতিমধ্যেই ২৩৭টি এস.ই.জেড. প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, "নীতিগত" অনুমোদন পেয়েছে আরও ১৬৬টি। অনুমোদিত অঞ্চল ৩৪,৫১০ হেক্টর (হেঃ) জমি অধিকার করবে। আর 'নীতিগত'ভাবে অনুমোদিত অঞ্চল দখল করতে চাচ্ছে এর ৪ গুণ জমি, ১,৩৪,৫৮৭ হেঃ (২)।

সাম্প্রতিক কালে আসা যাক। জলের ট্যাংক নির্মাতা প্যাটন ফলতায় ১.৩ কোটি ডলার (৬০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে বলে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছে (১০ই জুলাই, ২০০৬, উদ্ধৃত ইণ্ডিয়া ডেলি, ইন্টারনেট)। প্যাটন সরাসরি নেবে ২৫০ জন লোক, মানে এক লাখ ডলার বিনিয়োগ দেড়জন লোকের কাজ যোগাবে (এক কোটি টাকা পিছু ৩/৪টি চাকরি)। প্যাটন বলছে মোট ১০০০ লোক চাকরি পাবে। তার জন্য বাড়তি বিনিয়োগ কত লাগবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

সিঙ্গুরে চাকরিঃ ফের রূপকথা

সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানায় কত লোক নেবে তা প্রায় সামরিক গুপ্ত তথ্যের মত লুকানো রয়েছে। লোক নানা রকম আন্দাজ করছে। ডঃ দীপক বসুর প্রত্যাশা (৪) গাড়ি কারখানায় ৪০০০ লোক নেবে। অনেকেই মনে করবেন এটি বড় বেশি প্রত্যাশা, লোকের সংখ্যা ১০০০ পেরোবে কি না সন্দেহ।মেধা পটকর বলেছেন পুনে'র পিম্প্রিতে টাটাদের ইণ্ডিকা কারখানায় ৩০০ লোক মাত্র কাজ করেন। জেরেমি সীব্রুক (দ্য স্টেটসম্যান, ২৯.১২.২০০৬) সিঙ্গুরে ২৫০০ লোকের সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের কথা লিখেছেন ।

আর সেই মোটর কারখানার চারপাশে শিল্পের জোয়ারের গল্প? ডঃ দীপক বসু ২০০০ লোকের বেশি ভাবতে পারছেন না। সীব্রুক বরং ৭৫০০ লোকের কথা লিখেছেন।

ঠিক আছে। টাটারা ১০০০ কোটি টাকা (২১/২২ কোটি ডলার) বিনিয়োগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে যদি টাটার কারখানায় ৪০০০ চাকরিও হয়, তার মানে হবে এক লাখ ডলার বিনিয়োগ করলে ২টি চাকরি হচ্ছে (কোটি টাকা পিছু

● শ্রমিকবিরোধী ধারাগুলি যেমন ২০০৩'য়ে ছিল, ২০০৫'য়েও আছে। পঃবাংলার প্রধান শাসক দল এই ধারাগুলির কিছু পরিবর্তন সুপারিশ করে। কেন্দ্র সুপারিশ গ্রহণ করে নি, তারাও চুপ। পশ্চিম বাংলার আইনে এই ধারাগুলি প্রধান শাসক দল নিজেরাই রেখেছিল, ফ'লে এ ব্যাপারে তাদের আসল মনোভাব জানা হয়ে গেছে। তাদের দুর্বল প্রতিবাদকে তাই লোকদেখানো বলতে আবার বাধ্য হচ্ছি, বিশেষতঃ দেখার পর পুঁজিপতিদের জন্য জমি আদায় করার সুপারিশ তারা কেমন সজোরে চেঁচিয়ে হাসিল করলেন।

● এস.ই.জেড.'এর জমির অন্ততঃ ৫০% উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রাখার বাধ্যবাধকতা চেয়েছিল পঃ বাংলা সরকার। কেন্দ্র ৩৫% পর্যন্ত উঠেছে, হয়তো ৫০% মেনে নেবে।

আরো ২৫% জমি পরিকাঠামো নির্মানের কাজে ব্যবহার করতে হবে বলেছিল পঃবাংলার প্রধান শাসক দল। কেন্দ্র মানে নি, এরাও চুপচাপ -- এদের নিজেদের আইনে জমি ব্যবহার নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

● এস.ই.জেড'এর আকারের উপর সীমা ২০০৭'য়ের কেন্দ্রীয় আইনে তো ছিলই না, পঃ বাংলার ২০০৩ সালের বিল'এও ছিল না।

পঃ বাংলার প্রধান শাসক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্র এস.ই.জেড.'এর সর্বোচ্চ সীমা রাখছে ৫ হাজার হেঃ।

বিনিয়োগ মানেই কি চাকুরি?

ফলতা ও অন্যান্য বিশেষ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা (৩)ঃ

২০০০ সাল থেকে সারা দেশের রপ্তানি প্রোসেসিং অঞ্চল ই.পি.জেড.গুলিকে এস.ই.জেড.এ রূপান্তরিত করা শুরু হয়। ফলতার রূপান্তর ২০০৩ সাল থেকে।

কোচি, চেন্নাই, সান্টা ক্রুজ, সুরাট, কান্ডলা, ভাইজাগ, নোইডা, ফলতা এই ক'টি অঞ্চলে ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সালের গড় মোট বিনিয়োগ ছিল ৪০.৯১ কোটি মার্কিন ডলার, ফলতায় ছিল ৪.৫৪ কোটি।

মোট বিনিয়োগে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগের অনুপাত প্রথমে খুব কম ছিল। পরে বেড়েছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ এই ৬ বছরে এই অনুপাত কান্ডলা, সান্টা ক্রুজ, নোইডা, চেন্নাই, কোচি, ফলতা ও ভাইজাগ'য়ে বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ১.৩ থেকে ৪.৯, ৮.৪ থেকে ৯.২, ১২.৩ থেকে ১২.৭, ২৮.৪ থেকে ৩০.৭, ৯.৬ থেকে ১৩.৭, ৩.১ থেকে ৪, এবং ০ থেকে ৩৮.৮।

আর কর্মসংস্থান? ১৯৯৮-২০০৩ এই পাঁচ বছরের গড় করলে দেখা যায় এই সমস্ত অঞ্চলের মোট গড় কর্মসংস্থান ছিল ৮৭,৯৪৮ মানুষের। ফলতার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ২৫৯৭।

এই সমস্ত অঞ্চলে এই ৫ বছরের গড় হিসাব অনুযায়ী এক লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ পিছু ২১/২২ জন মানুষের চাকরি থেকেছে। ফলতার অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে ১৯৯৮-২০০৩ সালের গড় অনুযায়ী প্রতি লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ মাত্র ৫/৬ জন মানুষকে চাকরিতে রাখতে পেরেছে।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ আর ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ এই দুই সময়কাল তুলনা করা যাক।

প্রথম ১০ বছরে বিনিয়োগ ১৫.৩৯ কোটি ডলার বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে ৫২,১৭০ জনের। পরের ৫ বছরে বিনিয়োগ বাড়ে ১৬.৫ কোটি আর কর্মসংস্থান ১১,১৮২।

তা হলে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে এক লাখ ডলার বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ৩৪টি নতুন চাকরি তৈরি হচ্ছিল, এক কোটি টাকায় ৭৩টি চাকরি(নীট হিসাবে, অর্থাৎ নতুন চাকরি প্রাপ্তি থেকে বিয়োগ দিতে হবে পুরানো চাকরি হারানোর সংখ্যা)। কিন্তু নীট হিসাবে ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে এক লাখ ডলার বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে তৈরি হচ্ছিল মাত্র ৭টি নতুন চাকরি (এক কোটি টাকা বৃদ্ধিতে হচ্ছিল ১৫টি নতুন চাকরি)।

চীনের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছিলাম ভারতের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটছে -- বড় পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ছে, কিন্তু বিনিয়োগের একক পিছু চাকরি তৈরির হার দ্রুত কমছে।

পুঁজি বিনিয়োগ = কর্মসংস্থান, এই সমীকরণ অপরিণত ও অদূরদর্শী অর্থনৈতিক চিন্তার ফল। এই সমীকরণ যাঁরা প্রচার করছেন তাঁরা হয় দেশ ও রাজ্যের অর্থনৈতিক তথ্য ভালভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ না করেই দায়িত্বহীনভাবে মেঠো বক্তৃতা করছেন, বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকার কলমে বা টিভি চ্যানেলে সবজান্তা মন্তব্য বিতরণ করছেন, নিজ পক্ষের প্রশ্নহীন সমর্থকগোষ্ঠীর 'ক্লাস' নিয়ে চলেছেন, অথবা জেনেশুনে তঞ্চকতা করছেন।

শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ৬৬১০, স্থাবর সম্পদ ছিল ২১৭৮.২১ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ বছরটিতে এক কোটি টাকা স্থাবর সম্পদ পিছু ছিল ৩ টি চাকরি। ঐ বছর অবশ্য ঐ শিল্পে মোট বিনিয়োগ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩৩৫৯.০৫ কোটি টাকা, কোটি টাকা বিনিয়োগ পিছু চাকরি ছিল ২ টি। ফলতায় প্যাটন কারখানার চেয়ে খারাপ।

এবার দেখা যাক হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস তার ভাটির দিককার শিল্পে অর্থাৎ প্লাস্টিক শিল্পে কী প্রভাব ফেলেছে। প্রচারে বলা হচ্ছে বিনিয়োগ আর চাকরির নাকি বন্যা বয়ে যাচ্ছে। অন্ততঃ ২০০৩-০৪ বছরটি পর্যন্ত প্রভাব অনেক সীমিত বলেই আমাদের মনে হয়েছে। ঐ বছর প্লাস্টিক দ্রব্য শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ৬৬৪৩, স্থাবর সম্পদ ছিল ১৩৬.৩৪ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ বছরটিতে এক কোটি টাকা স্থাবর সম্পদ পিছু ছিল ৪৯টি চাকরি। ঐ বছর ঐ শিল্পে মোট বিনিয়োগ পুঁজির পরিমাণ ছিল ২০৯.৩৫ কোটি টাকা, কোটি টাকা বিনিয়োগ পিছু চাকরি ছিল ৩২টি। এই অনুপাত অবশ্য ফলতায় প্যাটন বা সিঙ্গুরে টাটার কারখানার চেয়ে ভাল। কিন্তু সঠিক অর্থে ছোট শিল্প যাকে বলে সেখানে এই একই সময়কালে আমরা দেখব বিনিয়োগের একক পিছু চাকরি হচ্ছিল এর ৪ গুণের বেশি। মোট চাকরির সংখ্যাও হলদিয়া পেট্রোকেমিকালসে ৬৬১০, প্লাস্টিক দ্রব্য শিল্পে ৬৬৪৩, একই মানের। এখন সারা রাজ্যে যেখানেই প্লাস্টিক ব্যবহার হয়, অনেক ক্ষেত্রে ২০০০ সালের আগে থেকেই, প্রত্যেকটিকে হলদিয়া পেট্রোকেমিকালসের ভাটির শিল্প বলে দাবি করলে মুস্কিল।

হলদিয়া পেট্রোকেমিকালসের শিক্ষা এই যে বিরাট বিনিয়োগের ভাটিতে যে শিল্প গড়ে ওঠে সেখানেও কর্মসংস্থানে ঘাটতি থাকে।

৪টি চাকরি)। আর যদি ১০০০ চাকরি হয় তা হলে কোটি টাকা দিয়ে হবে ১টি চাকরি।

যাবে কতজনের কাজ? চাষে থাকলে অধিগৃহীত জমিতে কটি শ্রমদিবস তৈরি হতে পারত বর্ষীয়ান কৃষক নেতা বিনয় কোঙার ৬ই ডিসেম্বর, ২০০৬, তারিখের 'গণশক্তি'তে তার একটা হিসাব করেছেন । ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৬, তারিখের 'দ্য হিন্দু'তে সি.পি.আই.(এম) দলের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত মহাশয়া লেখেন যে সিঙ্গুরে অধিকাংশ মানুষ কৃষিতে কাজ করেন না, মাত্র ১২৩০ ক্ষেতমজুর কৃষিতে কাজ করেন, তাও তাঁদের অন্য কাজও করতে হয়। সুতরাং খুব অল্প লোকেরই রুজি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অন্ততঃ বিনয়বাবুর কাছে সম্পূর্ণ ছবিটা আশা করা যেত। দুঃখের বিষয় আমাদের মত অপাত্রদের শেষে বিনয়বাবুকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে

(ক) কৃষিকে ঘিরে একটা পুরো গ্রামীণ অর্থনীতি চালু থাকে যে অর্থনীতির প্রতিটি কাজকে মাঠের শ্রমদিবস দিয়ে মাপা যাবে না, এবং

(খ) এ ছাড়া শ্রমের যে নিবিড়তা বিনয়বাবু ধরেছেন, কার্যতঃ নিবিড়তা তার চেয়ে কম থাকে, পুঁজি, সঙ্গতি, উদ্যোগ ও ইনপুটের অভাবে এবং জমির তারতম্যে। নিবিড়তা কমার অর্থ শ্রমদিবস বাড়া। তাহলে নিবিড়তা যেহেতু ব্যক্তিচাষী এবং তাঁর জোতের মাপ ও উৎকর্ষের উপর এতই নির্ভরশীল তাই কত লোক কাজ হারাবে তা সরাসরিই পরিমাপ করতে হবে, চাষের একটা আদর্শ নিবিড়তা ধরলে হিসাব ভুল হবে।

বৃন্দাজীর তথ্য, ক্ষেতমজুর ছাড়া আরও ৮৪০০ জন শ্রমজীবি কাজ করেন সিঙ্গুরের ওই নির্দিষ্ট মৌজাগুলিতে। কৃষি বন্ধ হয়ে গেলে, গ্রামীণ অর্থনীতি উঠে গেলে ওই শ্রমজীবিদেরও আর কাজ থাকবে না, বিনয়বাবুও কী সত্যিই এটা বুঝছেন না? আসুন এই

শ্রমজীবিরা কারা দেখা যাক। তা হলেই পরিষ্কার হবে তাঁরা কৃষি বন্ধ হয়ে গেলে কাজ পাবেন কি না।

সরকারী তথ্য ঘেঁটে 'সংহতি উদ্যোগ' (পিপলস সার্ভে, নভেম্বর, ২০০৬) জেনেছেন ক্ষেতমজুর আছেন ১২২৪ জন, শ্রমজীবি চাষী (কাল্টিভেটর) ১৩২০ জন, নথিভুক্ত বর্গাদার ২৭৫ জন (এ ছাড়া 'সংহতি উদ্যোগ'এর আন্দাজ মতো ১২০০ অনথিভুক্ত বর্গাদার), গৃহশিল্পে নিযুক্ত ৬৯১ জন, পশুপালনে ২০০ জন, সব্জি ফিরি করেন ১৫০ জন, সব্জি বহন করেন ৪৫০-৫০০ জন রিক্সাচালক। মোটর কারখানা হলে এঁদের কারও রুজি অটুট থাকবে?

আসলে সরকারী হিসাব (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সিঙ্গুর সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট) অনুসারে যে ৭৭১০ জন মূল শ্রমজীবি + ১০৩৪ জন প্রান্তিক শ্রমজীবি = ৮৭৪৪ জন শ্রমজীবি আছেন এই শাপগ্রস্ত পাঁচ মৌজায় তাঁদের সকলেই নিজের রুজি থেকে অপসৃত হবেন।

কিন্তু 'সংহতি উদ্যোগ'এর তথ্য এখনও শেষ হ'য় নি, প্রতি দিন ট্রেনে কিছুদূরের দরিদ্রতর এলাকা থেকে ১০০০ 'গাড়ির কিষেণ' এখানে মজুরি করতে আসেন। মরশুমে মজুরিতে নাবাল খাটতে আসেন ৮০০ ঝাড়খণ্ডি মানুষ (তিন মাস থাকেন ধরলে বছরভরের জন্য ২০০ই ধরলাম)। শেষ? আরে রতনপুরের হিমঘরে ৫০০০ মজুর বাইরে থেকে কাজ করতে আসেন। এই হিমঘরটা কি আর থাকবে পাঁচ মৌজার ফসল ওঠা বন্ধ হয়ে গেলে?

বৃন্দাজীর হিসাবেও ১৩২০ (ক্ষেতমজুর)+৮৪০০=৯৭২০ জন শ্রমজীবি মানুষ সকলেই রুজি হারাবেন। বৃন্দাজী 'গাড়ির কিষেণ' মরশুমি মজুর, রতনপুরের মজুর এঁদের ধরেন নি।

যে ভাবেই হিসাব করি, মোটর কারখানা হলে ১০,০০০য়ের বেশি মানুষ কাজ হারাবেন (মানে অতগুলি পরিবার)। মোটর কারখানা ও তার ভাটির শিল্পে ১০,০০০ কাজ যদি হয়ও, পাঁচ মৌজার কৃষি অর্থনীতি উচ্ছেদের ফলে তার চেয়ে বেশি বেকার তৈরি হবে।

হিসাবে রাজ্যের বাইরের মজুরদের ধরছি কেন? কেন ধরব না? টাটা কি কথা দিয়েছে তার সব চাকরি রাজ্যের লোকই পাবে? টাটার চাকরি স্থানীয় জমি হারানো চাষী বা জীবিকা হারানো মজুর পাবে না, এমন কি দক্ষতার প্রশ্ন তুলে পঃ বাংলার বাইরে থেকে শ্রমিক আনাই হতে পারে। টাটা ইণ্ডিকা কারখানার জন্য ১২৫টি পরিবার উচ্ছেদ হন। তাঁদের এক জন সদস্যও ঐ কারখানায় চাকরি পান নি।

সিঙ্গুরে ট্রেনিং দিচ্ছে? ১৭৯ জনকে? তাও ট্রেনিংয়ের পরে চাকরির গ্যারান্টি দিয়েছে? ট্রেনিংয়ের জন্য আবেদন পত্রেই লেখা আছে যে কাজের কোনো গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে না।

আসলে সিঙ্গুরে কারখানা খুললে নীট কর্মসংস্থান কমবে।

হলদিয়া পেট্রোকেমিকালসের অভিজ্ঞতা

হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও প্রধান শাসক দল এতই পঞ্চমুখ যে তাঁদের বক্তৃতা থেকে বোঝা শক্ত কোনটা বর্তমানের বাস্তব, কোনটা প্রতিশ্রুতি আর কোনটা আশা। তাই আমরা হলদিয়া পেট্রোকেমিকালসের নাম না করে পঃ বাংলা সরকারের ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ব ব্যুরো প্রকাশিত স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট (৫) থেকে পরিশীলিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য শিল্পের তথ্য খুঁজেছি। হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস চালু হয় সেপ্টেম্বর ২০০০য়ে। ২০০৩-০৪য়ে পরিশীলিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য

দুর্গাপুরে), কিন্তু রাজ্যের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যে অগণিত বেকার ছেলেমেয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাবার মত ব্যাপক কর্মসংস্থান দূর অস্ত রইল।

তোয়াজ করে বড় পুঁজি ডেকে এনে বেকার সমস্যার সমাধান তো হবেই না, বরং কৃষিজমি বড় পুঁজির হাতে তুলে দিলে উৎপাটিত কৃষক বেকারত্বের সমস্যা আরও বাড়াবে। চীনের অভিজ্ঞতাও তাই।

এই রূপকথার ভুলভুলাইয়া থেকে বার হবার জন্য আমাদের ১ নং দিকনির্দেশক ঃ কর্মসংস্থানের জন্য ছোট শিল্পের উপর জোর দিতে হবে, ছোট শিল্পে একক বিনিয়োগের চাকরি তৈরির ক্ষমতা আমরা দেখেছি বৃহৎ পুঁজির চেয়ে গড়ে ৯ গুণ বেশি, বিশাল বিনিয়োগের চেয়ে ৪৬ গুণ বেশি । পঃ বাংলায় বামফ্রন্ট ছোট শিল্পের পক্ষেই ছিল, কিন্তু 'উদার' অর্থনীতির চটজলদি 'শিল্পায়নের' মিথ্যা প্রতিশ্রুতির হাত ধরে প্রধান শাসক দল ছোট শিল্পের পক্ষ থেকে কার্যতঃ সরে যাচ্ছে, যদিও মুখে তা বলছে না। দেশিবিদেশি বড় পুঁজিকে নয়, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ছোট শিল্পকে প্রধান গুরুত্ব দিলে পরেই একমাত্র যথেষ্ট চাকরি তৈরি হতে পারে। তা না হলে বড় পুঁজির বিনিয়োগের কোটি কোটি টাকার গল্প বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ও ঝাঁ চকচকে রঙ ঝলমল পোস্টারে যতই বলা হোক, কাজের হাতগুলো খালিই থাকবে, বছর বছর বেকারবাহিনীতে যোগদানকারী ছেলেমেয়ে একটু এদিক সেদিক দেখে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বলবে "শিল্পায়ন না ছাই"।

কর্মসংস্থান আছে ছোট শিল্পে

চীনে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগের তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়।(৬) ১৯৮৩-৮৭ সালগুলিতে বিদেশি উদ্যোগ পিছু গড় বিনিয়োগের মূল্য ছিল ২১ লাখ মার্কিন ডলার। ১৯৮৮-৯২ ধরে

সিঙ্গুরে টাটার কারখানার ভাটির শিল্পে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি শুনে তাই মনে হয়, কৃপণের নিমন্ত্রণে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে পেট্রোকেমিকাল কারখানা বসাব না। ইস্পাত, প্লাস্টিক, মেশিন, রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়া অন্য শিল্প তথা উন্নয়ন এগোবে না। কিন্তু এই বিনিয়োগের উদ্দেশ্য নিয়ে অনৃত ভাষণ কেন? এই রকম বৃহৎ বিনিয়োগ আনুপাতিক হারে চাকরি দেয় না। আমরা দেখব কর্মসংস্থানের জন্য বড় বিনিয়োগের পিছনে ছুটে লাভ নেই, তার জন্য দরকার ছোট ছোট শিল্প স্থাপন ও লালন।

যেটুকু হচ্ছে তাতে আপত্তি কীসের?

প্রথমতঃ বৃহৎ পুঁজি নিজের মুনাফার স্বার্থে পুঁজিনির্ভর বিনিয়োগই করবে, শ্রমনির্ভর নয়, এটা জানা কথা। সে খুসিমত বিনিয়োগ করবেই, তাকে আটকানোর কোনো ব্যাপার নেই। সে যে ক'টা চাকরি দিতে চায় তাই দিক, এতে আপত্তি কোথায়? আপত্তি নেই, বা বলা ভাল পুঁজিপতি আপত্তিকে গ্রাহ্যই করবে না। কিন্তু সে যেহেতু আমাদের যা সব চেয়ে দরকার, শিল্পায়ন বলতে যা আমরা চাই -- কর্মসংস্থান, সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগছে না, তাই তাকে ডেকে এনে কর ছাড় দিয়ে, শ্রমিক শোষণের অবাধ অধিকার দিয়ে আমাদের ট্যাক্সের টাকায় জামাই আদর কেন? অন্যত্র যাবে? যদি আমাদের রাজ্যে তার মুনাফা বেশি হবে সে ভাবে তবে সে না ডাকলেও আসবে। জামাই আদর না করলেও থাকবে। কোথাও যাবে না। আর হিসাব করে যদি দেখে তার মুনাফা মার খাবে তবে আদর করলেও আসবে না।

আর সে তো এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে ৪টি চাকরি দেয়, এক্ষুনি আমরা দেখব ছোট শিল্পে ৪টি চাকরি তৈরি করতে ৩ লাখেরও কম টাকা বিনিয়োগ লাগে।

অর্থাৎ বড় পুঁজি এসে বিশেষ না হলেও দুট্টো চাকরি বানাবে তাতে কারো আপত্তি নেই। আপত্তি ওঠে যখন সরকার তাকে তোয়াজ করতে, অবাধ ছাড় দিতে শুরু করে।

দ্বিতীয়তঃ প্রবল আপত্তি ওঠে যখন তাদের ওই ক'টা চাকরির জন্য চাষের জমি কেড়ে নিতে আসে পুলিস আর রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র বাহিনী। করে বাড়িয়ে দেয় নীট বেকারত্ব।

কর্মসংস্থান হবে শিল্পায়নের এমন বিকল্প পথ কি আছে?

বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেল, মার্কিন বিশ্বায়ন নীতির প্রচারক সাংবাদিক ও অর্থনীতির পণ্ডিত, এবং প্রধান শাসক দলের নেতারা একটা ভাব দেখাচ্ছেন যে দেশিবিদেশি বৃহৎ পুঁজির এই কর্মসংস্থানবিহীন বিনিয়োগ ছাড়া শিল্পায়নের অপর পথ নেই, এবং এই নির্বোধ, অপরিণামদর্শী বিনিয়োগের সমালোচনা করার মানেই হল শিল্পায়নের বিরোধিতা করা।

গান্ধিবাদী থেকে মাওবাদী সবাই বিকল্প পথের কথা ব'লছেন। অর্থনীতির পণ্ডিতরা আবার একমত যে বিকল্প নেই। অধমের ঘাড়ে একটা বই দুট্টো মাথা নেই যে এমতাবস্থায় সে বিকল্প পথের

পসরা সাজিয়ে গুজিয়ে জাহাজ খুঁজবে। বরং বাংলা বাজারে তারই মতো যে আদার ব্যাপারীরা ঘোরে ফেরে তাদের সামনে চীন, ভারত ও আমাদের দুর্ভাগা রাজ্যের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে যে গুলি বিশ্বায়নের অর্থনীতির পণ্ডিতদের কাছে তুচ্ছ, কিন্তু যার মধ্যে থাকতে পারে বিকল্পের দিক নির্দেশক। আদার নৌকায় কি ভেনিজুয়েলা'ও যাওয়া যাবে? থর হেয়ারডেল থাকলে বলতেন, 'অবশ্যই'।

বিকল্প পথের ১ নং দিকনির্দেশক
কর্মসংস্থানের জন্য চাই ছোট শিল্প

'উদার' অর্থনীতির ১ নং রূপকথা ঃ দেশিবিদেশি বড় পুঁজির বিনিয়োগই শিল্পায়ন ঘটাবে, চাকরি দেবে

আমরা দেখলাম যে বড় পুঁজি ক্রমাগত বিনিয়োগের একক প্রতি কর্মসংস্থান কমিয়ে চলেছে। আমাদের রাজ্যের প্রধান সমস্যা বেকারত্ব। বিশাল পাঁচিল ঘেরা কারখানা হল, কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের খবরে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র আহ্লাদে আটখানা হল, কিন্তু বেকার সমস্যা যেমনকার তেমনই রইল, সেই 'শিল্পায়ন' দিয়ে আমাদের কী হবে? আমরা পঃ বাংলায় এ রকম 'শিল্পায়ন' বিধান রায়ের কংগ্রেসি জমানাতেও দেখেছি। বড় বড় কারখানা হল, ভাল বেতনের অল্প কিছু চাকরিও হল (বিশেষতঃ

হার কমে আসে ৬.৫%য়ে। কর্মসংস্থান বাড়ছিল বছরে ৬.৭% হারে (১৯৭৫-১৯৯৭), এই হার কমে দাঁড়ালো ৬.৩%(২০০০-২০০৪)।

২০০৩-০৪ বছরটিতে ১০১১৪টি ছোট উদ্যোগ নথিভুক্ত হয়(২০০২-০৩'য়ে এই সংখ্যা ছিল ১০৮৯৮)। কিন্তু ২০০৩-০৪'য়ে মাত্র ৫০৬৭টি উদ্যোগ উৎপাদন শুরু করে। অর্থাৎ ছোট মাপের শিল্প স্থাপনার ইচ্ছা অনেকের কিন্তু এদের অর্ধেকেরই আর শেষ পর্যন্ত মাঠে নামা হয় না।

সরকারও লক্ষ্য নামিয়ে আনছে। ২০০৪-০৫'য়ে তো ছোট মাপের শিল্প ও কুটিরশিল্প আধিকারিকের দপ্তরই লক্ষ্যস্থাপন করে যে ৩৬০৫টি একক উৎপাদন শুরু করবে। তার কারণ এই সরকার 'উদার' অর্থনীতির বেদম সমর্থক আর 'উদার' অর্থনীতির দর্শন অনুসারে বাজারে যদি ছোট শিল্প প্রতিযোগিতা করে দাঁড়াতে না পারে ত'বে সে মরুক, সরকার তাকে যেন আলাদা সুবিধা দিয়ে না বাঁচায় (বড় পুঁজিকে এস.ই.জেড.'য়ে যে সুবিধা দেওয়া হয় তার বেলা কিন্তু 'উদার' অর্থনীতির সুর অন্য)।

ছোট উদ্যোগের টিঁকে থাকার জন্য সরকারী সমর্থন একান্তই দরকার। এই পঃ বাংলায় 'অসুস্থ' উদ্যোগের সংখ্যা দেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশি। সারা দেশে যেখানে 'অসুস্থতা'র হার ২.৫৪%, পঃ বাংলায় এটি ৪.১৪%।

ছোট উদ্যোগ উৎপাদন আরম্ভ করতে সাহস পাচ্ছে না, 'অসুস্থ' হয়ে পড়ছে কেন? কারণগুলি এই রকম ঃ

- মালিক বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায় না।
- আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতি চালু নেই।
- সস্তায় পর্যাপ্ত ঋণ আর পাওয়া যায় না।

গড় মূল্য কমে আসে ১০ লাখে। ১৯৯৩-৯৭'য়ে আবার বেড়ে হয় ২১ লাখ। ১৯৯৮ থেকে ২০০১'য়ের মধ্যে আরও বাড়ে -- ২৫ লাখে গিয়ে দাঁড়ায় প্রকল্পের গড় কলেবর। ১৯৮৮-৯২ সালে কী হয়েছিল? এই সময় তাইওয়ান, হংকং, ম্যাকাও থেকে পুঁজিপতিরা এসে বহুসংখ্যক ছোট উদ্যোগ খোলে যেগুলি ছিল শ্রমনির্ভর। চীনে সরকারের অনুমোদন ছাড়া নীতি পালটানো কঠিন। শ্রমনির্ভর ছোট উদ্যোগ খোলার নীতি নিশ্চয় সরকার তখন সমর্থনই করেছিল। ফলে বিনিয়োগ সর্বস্বতায় ঝাঁপানোর আগে চীনা সরকার প্রকল্পের কলেবর ও শ্রমনির্ভরতা নিয়ে দোলাচলে ছিল বলেই ভাবতে হবে।

১৯৯৬ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে যখন সরকারী উদ্যোগের বেসরকারীকরণের ফলে ৫.৯ কোটি চাকরি উঠে গেল আর দেশিবিদেশি বড় পুঁজি ১.৬ কোটির বেশি চাকরি দিতে পারল না, তখন ছোট ও স্বনিযুক্তি নির্ভর শিল্পে ২ কোটি চাকরি সৃষ্টিই বেকারত্বের বিস্ফোরণ থেকে বাঁচালো চীনকে। (৭)

২০০২ সালে বেসরকারী বড় উদ্যোগের চেয়ে ছোট ও স্বনিযুক্তিনির্ভর উদ্যোগে দেড় গুণের বেশি (১.৭ গুণ) মানুষ চাকরি করছিলেন (৭)। সরকারী বেসরকারী সমস্ত বড় উদ্যোগ আর ছোট ও স্বনিযুক্তিনির্ভর উদ্যোগে কর্মরত মানুষের অনুপাত ছিল ২.৪ঃ ১ (৭)। ২০০০ সালে এই অনুপাত দুটি ছিল ১.৮ গুণ ও ৩.৩ঃ ১, ২০০১ সালে হল ১.৭ গুণ ও ২.৯৫ঃ ১ (৭)।

এই অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত করছে

- চীনা শিল্পে ছোট ও স্বনিযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের গুরুত্ব যথেষ্ট এবং এই গুরুত্ব বাড়ছে

- বেসরকারী বড় উদ্যোগের চেয়ে ছোট ও স্বনিযুক্তিনির্ভর উদ্যোগে বেশি লোক কাজ করেন এবং এই প্রবণতা ২০০০-২০০২'য়ের মধ্যে বেড়েছে।

এবার আসি সোজা আমাদের দেশে।

দেশের শিল্পক্ষেত্রের মোট উৎপন্ন আউটপুট'এর ৪০% আসে ছোট শিল্প থেকে। ২০০৩-০৪ এই এক বছরে দেশের শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ৭% হারে বেড়েছিল, ছোট শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল ৮.৬% হারে। ১৯৯০-২০০০ এই ১০ বছরে যেখানে সারা দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে গড়ে বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছিল ১.৯% হারে, ছোট শিল্পে কর্মসংস্থান গড়ে বেড়েছিল বছরপ্রতি ৪.২% হারে, দ্বিগুণের চেয়ে বেশি দ্রুততায়।(৮)

১৯৯০-৯১ আর ২০০০-০১ এই দশ বছরে ছোট শিল্পে বিনিয়োগ বেড়েছিল বছরে ৫.৭৫% হারে, আর কর্মসংস্থান বেড়েছিল ৫.১% হারে। এক কোটি টাকা বিনিয়োগ বাড়লে গড়ে কর্মসংস্থান বাড়ছিল ১৫০ মানুষের।(৯)

স্থায়ী সম্পদের দিকে তাকানো যাক।(১০) ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৮-৯৯, এই ৫ বছরে ছোট শিল্পে এক কোটি টাকা স্থায়ী সম্পদ বাড়লে নীট ১৯৩টি চাকরি হচ্ছিল। পরের ৫ বছরে এক কোটি টাকার স্থায়ী সম্পদ বাড়লে কর্মসংস্থান নীট বেড়েছে ১৪৪ জনের। ১৯৩ থেকে ১৪৪, হ্রাসের হার ২৫%, কিন্তু নীচে দেখব ১৯৮৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে বড় উদ্যোগে এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বাড়তি চাকরি তৈরির হার কমেছিল ৮০%।

এর পর দেখা যাবে মার্কিন বিশ্বায়নের চাপের ফল।

২০০০-০১ থেকে ২০০৩-০৪ এই ৩ বছরে গড়ে বছরপ্রতি বিনিয়োগের হার একটু কমে হল ৫.২৯%। কর্মসংস্থান বাড়ার হারও একটু কমে হয়েছিল ৪.৫%। এই তিন বছরের গড়ে এক কোটি টাকা বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বেড়েছিল ১৩৮ জনের।

১৫ বছরে চাকরি সৃষ্টির ক্ষমতা তা হলে সাড়ে ৮% ক'মেছে।(৯) এই তিন বছরে ছোট উদ্যোগে প্রতি এক কোটি টাকার স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির ফলেও নীট কর্মসংস্থান বেড়েছিল ১৩৮(১০)।

কিন্তু ১৯৮৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে দেশের এস.ই.জেড. অঞ্চলের বড় উদ্যোগে এক কোটি টাকার বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়ার হার ৭৩ থেকে কমে এসেছে ১৫তে, ৮০% হ্রাস(৩)। ৭৩ সংখ্যাটি ১৯৮৮-১৯৯৮ সালের জন্য প্রাসঙ্গিক, ১৫ সংখ্যাটি ১৯৯৮-২০০৩য়ের জন্য। আর হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস বা ফলতার প্যাটনকে দিয়ে যদি বিচার করি (আর এ রকম ভারি বিনিয়োগই তো পঃ বাংলা সরকারের পছন্দ) তবে তো এক কোটি টাকা বিনিয়োগে থাকে ২-৪টি চাকরি।

এখনও তাহলে ছোট শিল্পে কর্মসংস্থানের ক্ষমতা এস.ই.জেড.য়ের বড় উদ্যোগের চেয়ে ৯ গুণেরও বেশি। আর বিশাল উদ্যোগের চেয়ে ৪৬ গুণ বেশি।

পঃ বাংলাতেও ছোট ও কুটির শিল্প (৮) কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯১ থেকে ২০০১, এই ১০ বছরে এই কর্মসংস্থান ১০ লাখ থেকে বেড়ে ২২ লাখ হয়, চক্রবৃদ্ধি হারে বছরপ্রতি বাড়ার হার ছিল ৮.২% (এই সময়কালে মাল তৈরির ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছিল ৩৪ লাখ থেকে ৪৫ লাখ, চক্রবৃদ্ধি নিয়মে বছরপিছু বাড়ার হার ছিল মাত্র ২.৮%। আর সরকারী ক্ষেত্রে চাকরি তো কমেইছিল, বছরে ১.২% হারে)।

কিন্তু বিশ্বায়নের বাতাস বইছে। যেখানে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ছোট শিল্প উদ্যোগের সংখ্যা গড়ে বছর বছর বাড়ছিল ৮.৩% হারে, ২০০০ থেকে ২০০৪'য়ের মধ্যে এই বাড়ার

ধাপ তথ্য জানার অধিকার আইন, আর.টি.আই.কে কার্যতঃ চালু করার জন্য চাপসৃষ্টি। সরকারের কিছু আমলা ও কেরানী এই নতুন আইনকে জন্ম থেকেই ঠুঁটো করতে চাছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসছেন। সরকারের উচ্চতম মহল কী করবেন?

বড় পুঁজির জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করারও দরকার নেই। মার্কিন বিশ্বায়নের তত্ব অনুসারে বিদেশি পুঁজি দেশি বড় পুঁজিকে প্রলুব্ধ করছে রপ্তানি বাজারে ডলার আয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে। দেশে শিল্পভিত্তির কী দরকার? বলছেন বিশ্বায়নের প্রচারক অর্থনীতির পণ্ডিতবর্গ। তুনি যা পার রপ্তানি কর, বাজার তৈরি করে দিচ্ছে বিদেশিরাই, পরিবর্তে তোমার দেশের বাজার খুলে দাও, বিদেশি ভারি শিল্প তার তৈরি মাল রপ্তানি করুক।

এইভাবে মার্কিন বিশ্বায়ন চেষ্টা করছে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে নড়বড়ে ও পরনির্ভর করে রাখতে। দেশি বড় পুঁজি এখন তো তাতে সায়ই দিচ্ছে। তাই বলি দেশি বড় পুঁজির উপর নির্ভর করা যাবে না। তা হলে ভারি শিল্পের কী হবে?

রাষ্ট্র বিনিয়োগ করবে। এখন আমাদের দেশে প্রচুর সঞ্চয়, কর সংগ্রহও খারাপ না। আমাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় আর ট্যাক্সের টাকায় বড় পুঁজিপতি আর বিদেশি হাঙরদের না পুষে বিনিয়োগ করুন সরকার বাহাদুর। হ্যাঁ 'উদার' অর্থনীতির বিরুদ্ধে বলছি। বেসরকারীকরণের বিপক্ষেও।

বাজার আছে, পুঁজিবাদ আছে ধরে নিয়েই রাষ্ট্রের সক্রিয়তার কথা বলছি। 'মুক্ত' বাজার নিজে নিজে কেমন ভাবে চলে তার ব্যাখ্যা দিতে স্যামুয়েলসন সাহেবও ঢোঁক গিলবেন। বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ি লিখছেন পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে "একটি প্রক্রিয়ায় যেখানে প্রধানতঃ রাষ্ট্রই বাজারের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছে", অবশ্যই দেশের পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বার্থে, বৃহৎ

- বিশ্বায়নের ফলে আমদানি করা সস্তা মাল আর দেশের বড় পুঁজির মালের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা।
- সরকারী ক্রয় কমে গেছে ('উদার'তা দেখিয়ে সরকারী ক্ষেত্রের শিল্প তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারী হাতে)।
- সরকারী ও বেসরকারী দুই ক্ষেত্রেই ছোট উদ্যোগ থেকে কেনা মালের দাম ফেলে রাখা হয়, পরে পরে কিছু উৎকোচের পরিবর্তে দাম পাওয়া যায়।

প্রথম দুটি বিষয় ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি বিষয়ের বেলায় সরকার ইচ্ছা করলেই নিজেই সরাসরি সমাধান খুঁজতে পারে। প্রথম দুটি বিষয়েও সরকারই কার্যকরী চাপ দিয়ে সমাধান করিয়ে দিতে পারে।

যদিও অসুস্থতা ঠেকানো বা সারানোর ব্যাপারে সাধারণভাবে পঃ বাংলা সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কুফল প্রকট, বামফ্রন্ট ১৯৭৭'য়ের পর ছোট শিল্পউদ্যোগ শুরু ক'রার ব্যাপারে খুব সক্রিয়তা দেখায়। ইদানীংই প্রধান শাসক দল যেন তেন প্রকারেণ বড় পুঁজি ডেকে আনার ব্যাপারে আত্মঘাতী পথ ধরেছে।

কর্মসংস্থানের জন্য ছোট শিল্পকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়ার জন্য চাই প্রচুর সক্রিয়তা। কারণ বাজারের নিয়ম, ছোট উদ্যোগ গজাবে, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করবে, বড় পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না, উঠে যাবে। এই নিয়মের বিপক্ষে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে হবে সরকারকে।

- বিনিয়োগ অনুমোদনের সময় লালফিতার ফাঁস কেটে 'এক জানালা" নীতি চালু করতে হবে, কিন্তু প্রথমেই দেখে নিতে হবে, যে মাল উৎপাদন করতে চাওয়া হচ্ছে তার বাজার আছে কি না ও উদ্যোগকারীর ক্ষমতা কেমন ?

● ছোট শিল্পে ঋণদানের জন্য ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনী সংস্থা যাতে সচেষ্ট হয় তার জন্য নজরদারি রাখতে হবে

● কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপাদনে লাগবে এমন মাল বা যন্ত্রাংশের দরকারমত সহজে, সস্তায় ও ভর্তুকি সহকারে আমদানি, জল, বিদ্যুত, জ্বালানির নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে।

● ছোট শিল্প যে মাল তৈরি করবে সেই মাল বড় পুঁজি যাতে তৈরি করতে না যায় তার জন্য উপযুক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে

● সরকারী ও বেসরকারী ক্রেতা যাতে ছোট শিল্পের মালের দাম ঠিক সময়ে চুকিয়ে দেয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে

● উদ্যোগের চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখতে হবে যাতে অসুস্থতার চিকিৎসা গোড়াতেই করা যায় ।

এই কথাগুলির দু ধরনের প্রতিক্রিয়া আসন্ন। এক দল বলবেন বাজারকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না, লাইসেন্স ও কোটার রাজত্ব ফেরৎ আসছে। আমাদের উত্তর, বাজার মুক্ত থাকলে যদি চাকরি বাড়ে, বাজার মুক্ত থাক, আর একমাত্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করেই যদি চাকরি বাড়ে তো বাজারের ঝুঁটি ধরে থাকতে হ'বে। আজ চীনে পুঁজি যে আস্ফালন করতে পারছে তার শিল্পভিত্তি তৈরি হয়েছে বহুনিন্দিত মাও জে দঙেরই আমলে, বাজারের গলা টিপে ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের একচেটিয়া বিকাশের মাধ্যমে।

অন্য প্রতিক্রিয়াটি হবে ছোট শিল্পের জন্য এই কাজগুলি ক'রাই হচ্ছে। আমরা বলব করার কথা তো সরকারের নানা আইন কানুন, নথি পঞ্জি ভরে লেখা আছেই। কিন্তু যে ভাবে নেতা, আমলা, কেরানি, লেখক, সাংবাদিক, দলের কর্মী সমর্থক কোমর বেঁধে গলা, কলম, বন্দুক নিয়ে কর্মসংস্থানবিহীন বড়

পুঁজির সেবায় নেমেছেন সে ভাবে কি একবারও কর্মসংস্থানক্ষম ছোট শিল্পের সুস্থ বিকাশ সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার চেষ্টা হয়েছে? সে ভাবে করেই না হয় দেখা যাক। ছেলেমেয়েদের চাকরি জোগানো তো সত্যিই দরকার আর তা বড় পুঁজিকে দিয়ে যে হবে না সারা দেশ, সারা পৃথিবীতে তো একই অভিজ্ঞতা।

বিকল্প পথের ২নং দিক নির্দেশক
ভারি শিল্প কে করবে?

এখন ছোট শিল্প না হয় কর্মসংস্থান জোগাবে, কিন্তু ছোট শিল্পের উৎপাদনের জন্য যা যা দরকার তা কে বানাবে? লোহা ইস্পাত, মেশিন, বিদ্যুত জেনারেটর, ট্র্যাক্টর, ক্রেন, জাহাজ, প্লাস্টিক, ভারি রাসায়নিক দ্রব্য? এ গুলো তো ছোট শিল্প বানাতে পারবে না। মানে, ভারি শিল্প কোথা থেকে আসবে?

চাহিদা দেখলে, মুনাফা থাকলে বড় পুঁজি নিজেই ঢুকবে ভারি শিল্পে। জামশেদজি টাটাকে কি বৃটিশরা ইস্পাত কারখানা বসাবার জন্য তোয়াজ করেছিল? না পেট্রোকেমিকাল শিল্প গড়ার জন্য রিলায়েন্সকে হাতে পায়ে ধরতে হয়েছিল?

লাভের গন্ধ পেয়ে বড় পুঁজি ছোট শিল্পের আশেপাশেও অবশ্য ছোঁক ছোঁক করবে। সে প্রথমে চাইবে ছোট শিল্পের বাজার দখল করতে। কড়া হাতে সেটা ঠেকাতে হবে। না পেরে তখন বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রের দিকে যেতে বাধ্য হবে।

লাইসেন্স, পারমিট, কোটা রাজ? আবার বলি, নিশ্চয়ই। যে রোগের যে ওষুধ। লাইসেন্স, কোটা, পারমিট বলতে শিল্পোদ্যোগীর চোখে ভেসে ওঠে মাইলের পর মাইল লাল ফিতে আর প্রতি টেবিলের তলা দিয়ে ঘুষের খাম হস্তান্তর। এই অনাচার মোকাবিলা করতে শিল্পোদ্যোগীকেও নজরদারির ক্ষমতা দিতে হবে, যার প্রথম

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বদনাম কেন?

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বদনাম কিনেছে সেখানে কর্মসংস্থানই হয়, কর্ম হয় নাম মাত্র, ফলে জমে লোকসানের পাহাড়, শিল্পসংস্থা হলে রুগ্ন হয়ে মরে। এটা উচ্চতর স্তরে উদাসীনতার ফল, খারাপ পরিচালনার ফল। আমরা সরকারী দপ্তরের এই যে হাল হকিকতের সঙ্গে পরিচিত তার কারণ কী? তার কারণ পুঁজিবাদী জমানার একটি সাধারণ নিয়ম সরকারী পরিচালকরা প্রয়োগে অক্ষম ঃ ভালো কাজ করলে পুরষ্কার, খারাপ ভাবে কাজ করলে শাস্তিবিধান। সরকারী সংস্থায় পেশাদারি পরিচালক এনে তাঁদের হাতে এই ক্ষমতা দিতে হবে। আর পরিচালকদের উপরেও চাই নজরদারি, কর্মীরা সংস্থার কাজকর্ম মায় সুস্থতার উপর নজর রাখবেন, আমজনতাও নজর রাখবেন।

মূর্খের স্বর্গদর্শন? আসুন আর এক মূর্খের স্বর্গ দেখে আসি। স্থানের নাম ভেনিজুয়েলা। এখানে শাভেজ সরকারের সক্রিয় সমর্থনে মানুষ তৈরি করছেন কমুনাল কাউন্সিল। শহরে ২০০-৪০০ (গ্রামে আরও কম) পরিবার নিয়ে এলাকায় এলাকায় এই কাউন্সিলগুলি তৈরি হচ্ছে। লক্ষ্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নজরদারি, নানা জায়গার বাস্তুঘুঘুদের সঙ্গে তা নিয়ে টানাপোড়েনও চলছে। উৎসাহী মানুষ ১৯ হাজার কাউন্সিল বানিয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়া শিল্পসংস্থায় গড়ে উঠছে বলিভারিয়ান কাউন্সিল নামের শ্রমিক কাউন্সিল। (১৫)

সুতরাং মানুষকে বাদ দিয়ে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় নয়, মানুষের উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নতুন জীবন আনা যায়।

পুঁজির বিশাল কর্পোরেট সংস্থাগুলির মতলব হাসিলের জন্য নয় (১১)।

'উদার' অর্থনীতির আরও দুটি রূপকথা ঃ

- বিদেশি পুঁজিকে না ডেকে আনলে শিল্পায়নের ষোলো কলা পূর্ণ হয় না।
- শিল্পায়নের পথে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাধাবিশেষ। এই শিল্পগুলিকে বেসরকারি হাতে বিক্রি করে না দিলে এগোনো যাবে না।

বিদেশি পুঁজি ও লাতিন অ্যামেরিকা

এই রূপকথা অবশ্যই ছড়াচ্ছে মার্কিন বিশ্বায়নের প্রচারকেরা। এদের প্রচারে অভিভূত হয়ে পঃ বাংলা সরকার বিদেশি পুঁজি ডেকে ডেকে আনছেন।

১৯৯৬ সালে এই রাজ্যে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ ছিল খুবই সামান্য। তার পর প্রতি বছর বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আগের বছরের চেয়ে বেশি পরিমাণে এসেছে। ১৯৯৬ থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এসেছে ১৩৪.৬ কোটি মার্কিন ডলার পরিমাণের বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ। (১২)

বিদেশি পুঁজি ছাড়া উন্নয়নশীল দেশে 'শিল্পায়ন' হয় না, এই তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করতে যেতে হবে সেই সব দেশে যেখানে চলছে মার্কিন পুঁজির নাগপাশ থেকে বার হওয়ার প্রাণপণ লড়াই। বছরকার নীট বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগের অঙ্ক তুলনা করা যাক ২০০০ আর ২০০৫ সালে আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও ভেনিজুয়েলায় (১৩)।

আর্জেন্টিনাতে ২০০০ সালে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ হয়েছিল ৯৫২ কোটি ডলার, ২০০৫'য়ে এসে হল ৩৫৮ কোটিতে। মাঝে ২০০৩'য়ে হ'য়েছিল ৮৮ কোটি।

ব্রেজিলে এই বিনিয়োগ ৩০৫০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১২৫৫ কোটি ডলারে। ২০০৪য়ে ছিল আরো কম, ৮৩৪ কোটি ডলার।

বলিভিয়াতে ২০০০ সালে ৭৩ কোটি ডলার নীট বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ হয়েছিল। ২০০৫ সালে নীট বিনিয়োগ ছিল ঋণাত্মক, ঐ বছর নীট হিসাবে ২৮ কোটি ডলার দেশ থেকে বিদায় হয়।

ভেনিজুয়েলাতে ২০০০ সালে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ হয়েছিল ৪১৮ কোটি ডলার, ২০০৫ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১৪০ কোটি ডলারে। মধ্যে ২০০২ সালে এই বিনিয়োগ ছিল ঋণাত্মক, ২৪.৫ কোটি ডলার নীট দেশ ছেড়ে চলে যায়।

এদের মধ্যে অবশ্য ব্রেজিলের উপর বিশ্বায়ন আর 'উদার' অর্থনীতির প্রভাব রয়েছে।

মার্কিন জোয়াল সরানোর ব্যাপারে ভেনিজুয়েলা বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছে। এখানে মানুষ প্রেসিডেন্ট করেছেন উগো শাভেজ'কে। শাভেজ কিউবার সঙ্গে একত্রে তৈরি করছেন লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলির মার্কিন বিরোধী 'অ্যালবা' জোট। ১৯৭২ সালে ভেনিজুয়েলায় বিদেশি ৫৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ ছিল, ৮৫%ই তেল ব্যবসায়। এই বিনিয়োগের ৬৮% ছিল মার্কিন পুঁজি (১৪)। ১৯৭৬ সালে পেট্রোলিয়াম শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। তারপর অবশ্য ১৯৮৯ থেকে সরকারী তেল কোম্পানি পি.ডি.ভি.এস.এ. তার শাখা ও অধস্তন কোম্পানিতে সীমিত বিদেশি শেয়ার রাখার অনুমতি দিচ্ছে। কিন্তু দেশের বাইরে ডিভিডেন্ট চালান ক'রার উপর বিধিনিষেধ আছে, মুনাফার উপযুক্ত পরিমাণ দেশে পুনর্বিনিয়োগ না করলে ৩৪%

কর দিতে হয়। মূল পি.ডি.ভি.এস.এ. কোম্পানিতে এখনও বিদেশি শেয়ার নেই। ২০০০ সালে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগের ১৪.৩% ছিল মার্কিনীদের, অবশ্য আরও ১৭.৩% বিনিয়োগের কিছুটা বেনামে তাদের বলে সন্দেহ করা হয় (১৪)। যাই হোক, মার্কিন পুঁজি একটা ধাক্কা খেয়েছে। আই.এম.এফ. মারফৎ বিদেশি মুদ্রায় ঋণ দিয়ে 'উদার' অর্থনীতির শর্ত গ্রহণে বাধ্য করা মার্কিন বিশ্বায়ন অভিযানের পুরানো ছক। এ বার ভেনিজুয়েলা তার তেল বিক্রির বিদেশি মুদ্রা দিয়ে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ইকুয়াডর ও অন্যান্য দেশকে সাহায্য শুরু করেছে। সেন্টার ফর ইকনমিক পলিসি অ্যাণ্ড রিসার্চ ৩রা মে, ২০০৭, তারিখে জানাচ্ছে ভেনিজুয়েলা বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ. ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ইকুয়াডর তার দেশ থেকে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিকে বার করে দিয়েছে।

মার্কিন বিশ্বায়ন আর একটা ধাক্কা খেয়েছে বলিভিয়ায়। প্রেসিডেন্ট মোরালেস'এর সরকার বলিভিয়ার তেল শিল্প জাতীয়করণ করল ১লা মে, ২০০৬। বলিভিয়া 'অ্যালবা'তে যোগ দিয়েছে।

লাতিন অ্যামেরিকার অভিজ্ঞতা বলছে বিদেশি পুঁজি আর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ ছাড়াও শিল্পায়ন সম্ভব। সে পথে দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বলিভিয়া ও ভেনিজুয়েলার মানুষ বদ্ধপরিকর।

বিদেশি মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেনিজুয়েলা তেল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করল সেই সাহস দেখে উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন? তার স্বনির্ভরতার লড়াই দেখে হাততালি বাজাচ্ছেন দর্শকের আসন থেকে? খালি প্রেসিডেন্ট শাভেজকে মালা পরালে হবে? একটু তার মত করে দেখান না। না কি আপেক্ষায় আছেন যদি ভেনিজুয়েলা পেরে না ওঠে?

(৭)অজিত কে. ঘোষ; পূর্বোল্লিখিত।
(৮)রাহুল গুপ্ত ও ঈশিতা মুখার্জি, স্কোপ অফ কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দি আর্লি ২০০০, ৩রা জুন, ২০০৬, সোশাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ই-লাইব্রেরি)।
(৯)ছোট মাপের শিল্প মন্ত্রক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৪-৫।
(১০)বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দপ্তর, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যাণ্ডবুক ২০০৩-০৫।
(১১)অমিত ভাদুড়ি, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলী, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭।
(১২)পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপস ইন ইণ্ডিয়া, ১.০৪.২০০৭, অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার।
(১৩)স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ারবুক অফ ল্যাটিন অ্যামেরিকা অ্যাণ্ড দ্য ক্যারিবিয়ান, ২০০৬।
(১৪)এন্সাইক্লোপিডিয়া অফ দি নেশনস, টমসন গেল, (ইন্টারনেট), ২০০৬।
(১৫) গ্রীন লেফট উইকলী, ২৫শে এপ্রিল, ২০০৭।
(১৬)পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি, ৫ম লোক সভা, ২১নং রিপোর্ট, এপ্রিল, ১৯৭২; ৪৩নং রিপোর্ট, ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
(১৭)মাইকেল কিড্রন, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৫।

একটা ভাব দেখান বিশ্বায়নের প্রচারকরা যেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প লোকসানের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই বেসরকারীকরণ দরকার। এটা যে কুযুক্তি তার প্রমাণ ঐ প্রচারকেরাই কিন্তু লাভজনক সরকারী সংস্থারও বেসরকারীকরণ চাইছেন।
আসলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারীকরণের হৈ চৈ দুটি কারণে।

- বিদেশি পুঁজি তো চায় না আমাদের দেশে স্বনির্ভর শিল্পভিত্তি হোক। স্বনির্ভর হলে তাদের কাছ থেকে দুর্মূল্য শিল্পসামগ্রী কেনা বন্ধ হয়ে যাবে। একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে কেমন করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের স্বনির্ভরতা রোধে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে বিদেশি পুঁজি।

ভারত হেভি ইলেক্ট্রিকালস (বি.এইচ.ই.এল.) তার ভোপাল, হরিদ্বার আর তিরুচিরাপল্লি'র তিনটি কারখানা মিলিয়ে নানা বিদেশি সহযোগিতা ব্যবহার করে ১০০-২০০ মেগাওয়াটের (মেও) বিদ্যুত জেনারেটর (ও সংশ্লিষ্ট টার্বাইন) এবং ট্র্যাকশন সরঞ্জাম তৈরি করতে শুরু করে। এর মধ্যে ১২০ মেও পর্যন্ত মেশিন বি.এইচ.ই.এল.এর নিজের তৈরি করার ক্ষমতা হয়েছিল, এবং স্বনির্ভর ভাবে ২০০ মেও মেশিন তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন এখানকার ইঞ্জিনীয়াররা। এই স্বনির্ভরতাকে আঁতুড়ে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসে বিদ্যুতের বহুজাতিক কোম্পানি সীমেন্স। ভারত সরকার বি.এইচ.ই.এল.কে সীমেন্সের সঙ্গে এক ১৫-সালা "সহযোগিতা"য় ঢুকতে বাধ্য করে। স্বনির্ভর যে কার্যক্রম পরিকল্পিত হয়েছিল তা বানচাল করে সীমেন্স-নির্ভর ৫০০ মেও মেশিন তৈরির 'উন্নততর' কর্মসূচী গিলতে হয়।(১৬)

- এ ছাড়া দেশি বৃহৎ পুঁজি বৃটিশরা চলে যাওয়ারও আগে থেকে ছক কষছে যাতে সরকারের, মানে দেশের লোকের পয়সায় ভারি বিনিয়োগ করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে মুনাফা নেই বা মুনাফা দেরিতে আসে অথচ যে সব ক্ষেত্র না বাড়লে বেশি

মুনাফার শিল্প বড় পুঁজিপতিরা খুলতে পারবে না। "বোম্বাই পরিকল্পনা" নাম দিয়ে ভবিষ্যতের যে দলিল ১৯৪৪ সালে সই করেন জিডি বিড়লা, জেআরডি টাটা, পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, শ্রীরাম, কস্তুরভাই লালভাই ও অন্যান্য বড় পুঁজিপতি, তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল (১৭) ঃ

"প্রথমের দিকে বিদ্যুত শক্তি ও শিল্প বিনিয়োগের জন্য জরুরী ভিত্তিপণ্য উৎপাদনের দিকেই মূলতঃ নজর দিতে হবে", "মেশিন তৈরি, রাসায়নিক দ্রব্য এই ধরণের মৌলিক শিল্পে বিশেষ জোর দিতে হবে"। পুঁজি সংগ্রহ করবে সরকার ঘাটতি বাজেট মারফৎ, ৩৪% পর্যন্ত নোট ছাপানোর পক্ষে মত ছিল স্বাক্ষরকারীদের। "এইভাবে [ঘাটতি বাজেট দিয়ে] লগ্নি সংগ্রহের ফলে এই পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর উপর যাতে চাপ বা বোঝার বৈষম্য না ঘটে তার জন্য সরকারকে অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি দিক এত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও উদ্যোগের স্বাধীনতা সাময়িকভাবে লোপ পাবে"। "জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য বা নিরাপত্তার জন্য যে ক্ষেত্রেই সরকার বিনিয়োগ করবে মালিকানা হবে সরকারের"। "তা ছাড়া যেখানে সাধারণের স্বার্থে কোনো শিল্পে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কিন্তু শিল্পের অবস্থা এমন যে মালিকানা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হবে না, সেক্ষেত্রেও সরকারী মালিকানার দরকার হবে"। নতুন শিল্পে প্রথমে সরকারকেই বিনিয়োগ করতে হবে। বলা বাহুল্য বলাই আছে যে পরে বেসরকারী পুঁজি আগ্রহ দেখালে বেসরকারী মালিকানা চালু হতে পারে, সরকারী নিয়ন্ত্রণে। আর সাধারণের স্বার্থে খুব জরুরি না হলে সরকারী প্রকল্পের পরিচালনাও বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

নীলছাপটা ফুটে উঠছে না? ভারি ও ঝুঁকিসম্পন্ন বিনিয়োগ আমাদের টাকায় সরকার করবে। যেই লাভের মুখ দেখবে

বেসরকারী পুঁজির হাতে মালিকানা তুলে দেবে, অন্ততঃ পরিচালনা। সেই "বোম্বাই পরিকল্পনা" চক্রান্তের অন্তিম ফল আজ হাতে চাচ্ছে বেসরকারী বড় পুঁজি। সরকারী ঠেকনা আর তাদের চাই না, চাই লোকের ট্যাক্সের টাকায় এতদিন ধরে তৈরি লাভজনক সমস্ত সরকারী সংস্থা।

যুগপৎ মার্কিন বিশ্বায়ন ও দেশি বড় পুঁজির বহু দিনের চক্রান্তের ফলে আজ বদনাম দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে 'উদার' অর্থনীতির শিকার করা হচ্ছে। আসল ঘটনা, শিল্পভিত্তি যে টুকু দেখা যাচ্ছে তার অনেকটাই হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ঘাড়ে চেপে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে অচ্ছুত করার কোনো কারণই নেই। ভারি শিল্পে বেসরকারী বড় পুঁজির বিকল্প কী? রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প।

কর্মসংস্থানে ছোট শিল্প আর ভারি শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ শিল্পায়নের এই দুই পা। শিল্পায়নের যে রূপকথা আমাদের ইদানীং বলা হচ্ছে তাতে কোনো পা'ই নেই। বিকলাঙ্গ এই শিল্পায়নকে টেনে হিঁচড়ে নেবে নাকি দেশিবিদেশি বেসরকারী বড় পুঁজি। রক্তই ঝরবে। না বাড়বে চাকরি না তৈরি হবে শিল্পভিত্তি।

সূত্রঃ

(১) দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এস.ই.জেড. বিল, ২০০৩।

(২) প্রসেনজিৎ বোস, দ্য মার্ক্সিস্ট, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬।

(৩) প্রমেশ নায়ার ও ব্রাইট সিং, এস.ই.জেড. ড্রাইভ ইন গুজরাট, গভর্নমেন্ট অফ গুজরাট এ.এম.এ. সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, মে ২০০৬।

(৪) দীপক বসু; পূর্বোল্লিখিত।

(৫) স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, পঃ বঙ্গ সরকার, বিভিন্ন সংখ্যা।

(৬) কে.সি.ফুং ও অন্যান্য; পূর্বোল্লিখিত।

সরকারী হিসাব বলছে ১৯৮৭-৮৮ সালে যেখানে গ্রামের ৪০% পরিবার ছিলেন ভূমিহীন, ১৯৯৯-২০০০'য়ে এসে ভূমিহীন পরিবারের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৫০% (২)। ২০০০ সালে এসে তা হলে দেখা যাচ্ছে গ্রামের অর্ধেক মানুষ ভূমিহীন। ১২ বছরে ভূমিহীনতা ২৫% বেড়েছে। চাষী আর ক্ষেতমজুরের অনুপাত ১৯৯১-২০০১ এই ১০ বছরে ১.১৯ গুণ থেকে কমে এসেছে ০.৭৭ ভাগে (২)।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৩.৯ লাখ একর জমি খাস হয়েছিল (ভেস্টেড), ১১.১ লাখ জমি বন্টন হয়েছে। (২,৫) তবু পড়ে থাকে ২.৮ লাখ একর, মোট ভেস্টেড জমির ২০%। এই খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হয়ে যাওয়ার কথা।

শুধু তাই নয়।

যাঁদের জমি বিলি করা হয়েছিল তাঁদের ১৩% সেই জমি ২০০১ সালের মধ্যে হারিয়েছেন (২)।

যে বর্গাদাররা নাম নথিভুক্ত করেছিলেন, তাঁদের ১৪.৪% বর্গাজমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন (২)। এই সরকারী সমীক্ষাগুলি যাঁরা করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন নথিভুক্ত বর্গাদারদের মধ্যে ২৬% তাঁদের বর্গা অধিকার সম্বন্ধে নিরাপদ বোধ করছেন না (৬)। এই পুরো সময়কাল ধরেই অবশ্য পঃ বাংলায় বর্গা প্রথার গুরুত্ব কমেছে (৪)। বর্গা আছে এমন জমির অনুপাত ১৯৭০-৭১'য়ে ছিল ৩০.৬%, ১৯৮২তে তা হয় ১১%, ১৯৯০-৯১তে এসে দাঁড়ায় ৮.৫%। এই বছরগুলিতে চাষের জমির যে অনুপাত বর্গায় ছিল তা যথাক্রমে ১৭.৩%, ৬.৯% ও ৪.৮%।

১৯৯০-৯১ থেকে ২০০০-০১, এই ১০ বছরে চাষীর সংখ্যা ১৩% কমেছে, আর ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৩৪% বেড়েছে (৭)। পঃ বাংলায় সরকারী হিসাবে এই সময়কালে গ্রামের শ্রমজীবি মানুষের সংখ্যার সঙ্গে চাষীর সংখ্যার অনুপাত ৩৪% কমেছে, ক্ষেতমজুরের

তৃতীয় অধ্যায়
কৃষিঃ শিল্পদ্রব্যের বাজার

বিকল্প পথের ৩ নং দিক নির্দেশক
শিল্পদ্রব্যের বাজারঃ কিনবে তো কৃষক

ছোট শিল্প টিঁকবে যদি তার বাজার থাকে। সরকার তার মালের একটা বড় অংশ কিনে তাকে এককালীন সুরক্ষা দিতে পারে, কিন্তু সেই মাল বিক্রি হলে তবেই তো ব্যবসার চাকা ঘুরতে থাকবে। বিশেষ কোনো কোনো মাল ছাড়া সাধারণভাবে রপ্তানি বাজারে ছোট শিল্পের মালের চাহিদা খুব একটা দেখা যাবে এমন আশা না করাই ভাল, অন্ততঃ প্রথম দিকে। দেশের বাজারই এখানে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ছাত্রাবস্থায় যখন আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)'র প্রভাবের বলয়ে আসি তখন নেতারা একটা সরল অর্থনীতি শিখিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠত, ভূমি সংস্কারে শহরের ছাত্রছাত্রী বেকার যুবার কী লাভ? উত্তর শিখেছিলাম, দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাসী, তাই গ্রামের মানুষের হাতে পয়সা এলে তবেই শিল্পদ্রব্যের সুস্থির বাজার তৈরি হবে, সেই বাজারে যোগান দেওয়ার জন্য কল কারখানা বসবে।

দেশের অবস্থায় কি এমন যুগান্তর এসে গেছে যে এই যুক্তি আজ অচল?

পরিবর্তনের মধ্যে পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ঘটেছে। যাঁদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত বলা হয় তাঁদের একটা নিজস্ব বাজার গড়ে উঠেছে, দেশিবিদেশি বড় পুঁজি যে বাজারে মাল ঢালতে

উৎসাহী। পরিষেবা ২০০৪ সালে সারা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন জিডিপি'র ৫৬% যুগিয়েছিল। কৃষি যুগিয়েছিল ২২% কিন্তু কর্মসংস্থানের ৬০.৫% এসেছিল কৃষি থেকে। কর্মসংস্থানের মাত্র ২৩% এসেছিল পরিষেবা থেকে।(১)

শেষ জনগণনা বলছে পঃ বাংলার জনসংখ্যার ৭২% এখনও গ্রামে থাকেন। এবং এঁদের ৭৭% কৃষিজীবি।(২) আর একটি সরকারী সূত্রে প্রকাশ পঃ বাংলার জিডিপি'তে কৃষির অংশ এখনও ৩০% আর কর্মসংস্থানের ৫৭%ই কৃষিতে (৩)। গ্রামীণ মানুষের ৩৩% গরীবি সীমারেখার নীচে, গ্রামের যে ২৩% লোক কৃষিজীবি নন তাঁদেরও ২৯% গরীবি সীমার তলায়(২)।

সুতরাং শিল্পবিকাশের জন্য কৃষকের হাতে পয়সা পৌঁছানোর প্রয়োজন যথেষ্টই রয়েছে। যাঁরা বলছেন কৃষির যা উন্নয়ন হয়েছে তা যথেষ্ট এবার শিল্পের দিকে তাকাতে হবে, যতই কৃষি আমাদের ভিত্তি তাঁরা বলুন না কেন তাঁরা ভুলে গেছেন যে বাজার ও চাহিদা ছাড়া শিল্পবিকাশ সুস্থির হয় না, শিল্পের মজবুত ভিত্তি গড়ে ওঠে না, আর পঃ বাংলায় সেই বাজারের ভিত্তি গ্রামীণ মানুষের চাহিদাবৃদ্ধি যার চাবিকাঠি তাঁদের আয়বৃদ্ধি। সিঙ্গুরের মোটর কারখানার কাণ্ড থেকে পরিষ্কার, যে শিল্পায়নের রূপকথা আমাদের শোনানো হচ্ছে তাতে গ্রামীণ মানুষের আয়বৃদ্ধির কোনো নীলছাপ নেই। ফলে এই শিল্পায়ন থাপছাড়া, ভিত্তিহীন থেকে যেতে বাধ্য ।

ভূমি সংস্কার হয়ে গেছে? আর একটি রূপকথা

কৃষকের আয়বৃদ্ধিতে কৃষির ভূমিকা ফুরিয়ে গিয়েছে এ রকমটা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে ভূমি সংস্কার হয়ে গেছে, ভূমিহীনদের হাতে উদ্বৃত্ত জমি বেঁটে দেওয়া হয়েছে, ফলে কৃষিজমি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, আরও টুকরো টুকরো হচ্ছে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে, ফলে ভূমি সংস্কার করে কৃষকের হাতে জমিসম্পদ দেওয়ার সম্ভাবনা আর নেই, আর ঐ খণ্ড খণ্ড জমি চাষ করে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে লাভ বাড়ানোও অসম্ভব বললেই চলে। তাই কৃষকের ছেলেমেয়ের শিল্পে চাকরি খুঁজতে হবে।

কৃষকের ছেলেমেয়ের শিল্পে চাকরির সংস্থান তো খুব ভালো কথা যদিও আমরা দেখলাম সিঙ্গুরের পথে বড় পুঁজিকে ডেকে এনে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু ভূমি সংস্কার কি সত্যিই শেষ? ভূমিহীনের জমির সমস্যা মিটে গেছে? তথ্য কী বলে?

বর্গা নথিভুক্ত করা ও জমি বিলির ব্যাপারে পঃ বাংলায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।

সরকারী হিসাব মত ২০০১ সালে চাষী জনসংখ্যার ৩০%কে বর্গাদার বলে নথিভুক্ত করা হয় (২)। ২০০২ সালের মধ্যে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪০.৩% হয় বর্গা স্বীকৃতি নয় জমি বিলির আওতায় এসে পড়েন (২)। একটি বেসরকারী সমীক্ষা (৪)অনুযায়ী ২০০১ সাল পর্যন্ত চাষী ও ক্ষেতমজুর জনসংখ্যার ১১.৭% বর্গাদার স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ২১.২% জমিবিলি দ্বারা উপকৃত হন (মোট ৩৩% ভূমিসংস্কারে উপকৃত হন)।

সারা ভারতের বিচারে এই সংখ্যাগুলি নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এর মানে কি ভূমি সংস্কার শেষ?

কী করণীয়?

(ক) আমরা দেখলাম ভূমিহীনতা বাড়ছে। গ্রামীণ শ্রমজীবি মানুষের অনুপাতে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে। সিলিং বহির্ভূত জমি উদ্ধার চালু রাখতে হবে, ভেস্টেড জমি দ্রুত বিলি করতে হবে যাতে ভূমিহীনদের হাতে অল্প সল্প হলেও জমি আসতে থাকে।

(খ) ছোট জোত হাতছাড়া হয়ে বড় জোতের মালিকের অধিকারে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সচেতনভাবে আটকাতে হবে।

(গ) আমরা দেখলাম গরীব চাষী জমি রাখতে পারছেন না কারণ চাষী হিসাবে তাঁকে স্বয়ংনির্ভর করতে গেলে যে ঋণ ও ইনপুট সরবরাহ করতে হত তা নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা ছিল না, অন্ততঃ যথেষ্ট ছিল না।

তা হলে খালি জমি দিয়ে বসে থাকলে হবে না। সেই জমি যাতে কৃষক লাভজনক ভাবে চাষ করতে পারেন সে ব্যাপারে সরকারকে সক্রিয় থাকতে হবে। বিদ্যুত, সেচের খাল আর পাম্প, সুলভ ঋণ, সস্তায় পর্যাপ্ত ইনপুট নিয়ে হাজির থাকতে হবে।

(ঘ) ন্যায্য মূল্যে, দরকার পড়লে ভর্তুকি দিয়ে চাষীর ফসল ক্রয়, সংরক্ষণ এবং বিপণনের পরিকাঠামো (ঋণ, গুদাম, হিমঘর, রাস্তা, যানবাহন, বাজার, মূল্যের উপর নজরদারি) সারা রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে।

(ঙ) তবু ছোট জমির অধিকারীরা বড়দের সঙ্গে পেরে উঠবেন না যদি না তাঁরা মালিকানা অটুট রেখেই একসঙ্গে চাষ শুরু করেন, বড় জমিখণ্ডে চাষ। তবে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে গেলে নন্দীগ্রামের ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি হবে। ধৈর্য ধরে বোঝাতে হবে। জমির ব্যক্তিমালিকানা ত্যাগ না করে কোঅপারেটিভ, এই ব্যাপারটা মানুষকে বোঝানো যায়ই। তার প্রমাণ গুজরাটের আনন্দ দুধ কোঅপারেটিভ।

অনুপাত ২% বেড়েছে (২)। তা হলে কৃষি থেকে লোক অন্যত্র কাজ খুঁজতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

ধনী কৃষক অর্থনীতির উন্মেষ?

শুধু তাই নয়। খুব কম জমির মালিকদের যেমন পরিবারপিছু চাষের জমি অল্প বেড়েছিল, বেশি জমির মালিকদেরও চাষের জমি বেড়েছিল। বিভিন্ন মাপের জোত ধরে জোতের সেই মাপের মধ্যে মোট জমির কত অংশ পড়ছে আর মোট জোতসংখ্যার কত অংশ পড়ছে, এই দুইয়ের অনুপাত কষলে দেখা যাচ্ছে ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৯১-৯২তে ০.০০২ থেকে ০.০২ হেক্টরের মধ্যে যে জোতগুলির মাপ তাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১.৭ গুণ বেড়েছে, কিন্তু ২ থেকে ৩ হেক্টরের মধ্যে যাদের মাপ তাদের ক্ষেত্রেও অনুপাতটি বেড়েছে ১.৫ গুণের বেশি (অন্যান্য মাপের জোতে এই অনুপাত ১.৫ গুনের বেশি বাড়ে নি)(৪)।

সব মিলিয়েও জমির মালিকানায় অসমানতা বেড়েছে। একটি বেসরকারী নমুনা সমীক্ষা (৮) অনুযায়ী ৫ একর পর্যন্ত মাপের জোতের মধ্যে ১৯৭৮য়ে পড়ছিল ৯৩.৭% পরিবার, এঁদের হাতে মোট জমির ৫৬.৭% অংশ ছিল, জমির শতাংশ আর পরিবারের শতাংশ এই দু'য়ের অনুপাত ছিল ৬০.৫% । ১৯৯৮তে ৫ একর পর্যন্ত মাপের জোতের মধ্যে পড়েছিল ৯৭.৮% পরিবার, যাঁদের হাতে ছিল জমির ৭৩.৯%, জমির শতাংশ ও পরিবারের শতাংশ এই দু'য়ের অনুপাত ছিল ৭৫%, ২০ বছরে বেড়েছে ১.২ গুণ। কিন্তু ৫ থেকে ১২.৫ একর অবদি মাপের জোতের মধ্যে ১৯৭৮য়ে ছিল ৬.৩% পরিবার যাঁদের হাতে ছিল জমির ৪৩.৪%, দু'য়ের অনুপাত ৬৮৯%। ২০ বছর পর ৫-১২.৫ একরের জোতের মধ্যে পাওয়া গেল ২.৩% পরিবারকে, যাঁদের হাতে দেখা গেল জমির ২৬.১%, দুয়ের অনুপাত ১১৩৪%, ২০ বছরে ১.৬ গুণ বৃদ্ধি।

আরও মোটা দাগে দেখা যেতে পারে জমির মালিকানায় কেমন বৈষম্য রয়ে গেছে।

১৯৭৮য়ে ১২.৫ একর, অর্থাৎ জমির ঊর্ধ্বসীমার সমান বা বেশি জমি আছে এমন পরিবারের অনুপাত ছিল ১.৬%। এঁদের হাতে ছিল জমির ১৯.৫%।

৪৭.৩% পরিবার ছিলেন ভূমিহীন।

১৯৯৮তে ১২.৫ একর বা তার বেশি জমি আছে এমন পরিবারের অনুপাত ছিল ০.৩%। কিন্তু এঁদের হাতে ছিল জমির ৭.৬%। আর বেনামিতে? কেউ জানে না।

৫২.৩% পরিবার ছিলেন ভূমিহীন।(৮)

বড় জোত রয়ে গেছে অল্প হাতে। খোঁজ নেওয়া জরুরি ফের বেনামিতে ঊর্ধ্বসীমার উপরে জমি জমছে কি না।

ভূমিহীনের অনুপাত বেড়েছে।

এ কেমন পরিণাম ভূমিসংস্কারের ?

এ সবের অর্থ গ্রামাঞ্চলে এক দিকে চাষী জমি হারিয়ে মজুর হচ্ছে, অন্যদিকে জমির মালিকানা অল্প হাতে জড়ো হওয়ার ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। 'পশ্চিমবঙ্গ মানব বিকাশ সমীক্ষা'য় সরকারী মন্তব্য ঃ "রাজ্যের গ্রাম এলাকায় এক 'নব্য ধনী' সম্প্রদায় দেখা যাচ্ছে, উদ্বৃত্তের অধিকারী কৃষকদের পাশাপাশি আবির্ভাব ঘটেছে বেতনভোগী ও ব্যবসায়ীকুলের, এদের সকলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমবর্ধমান" (২)।

জমি কেবলই খণ্ড খণ্ড হয়ে চলেছে তা নয়, পাশাপাশি অবাঞ্ছিত ভাবে অল্প হাতে কেন্দ্রীভূতও হচ্ছে।

ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও এই অবস্থা কেন হল? সেই কারণগুলির মধ্যেই রয়েছে উন্নতির দিকনির্দেশ।

● সামান্য জমি পেয়েছেন ভূমিহীন চাষী, কিন্তু সে জমিতে পর্যাপ্ত ফসল ফলাবার জন্য লাগতো উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জল বা পাম্পের বিদ্যুত, আর এ সব জোগাড় করে চাষ হাসিল করার জন্য সুলভ ঋণ। ১৯৮৪-৮৫'র একটি হিসাব অনুযায়ী মোট চাষী পরিবারের কেবল একশ ভাগের এক ভাগের হাতে পৌঁছায় মিনিকিট। ১৯৯৪-৯৫তে এসেও মিনিকিট সরবরাহ পৌঁছায় একশ ভাগের মাত্র চার ভাগ পরিবারে।(৯) আবার অন্য এক প্রামাণ্য নমুনা সমীক্ষা (৮)অনুযায়ী ১৯৮২ সালে একশটি পরিবারের ২৪টিতে মিনিকিট পৌঁছায়, ১৯৯৫তে পৌঁছায় একশটি পরিবারের ১০টিতে।

● ১৯৮৩ সালে পঃ বাংলায় কৃষিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রদত্ত হেক্টর প্রতি ঋণ ভারতের গড়ের চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু ১৯৯৩ সালে কৃষিতে হেক্টর প্রতি ঋণ সারা ভারতের গড়ের চেয়ে বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল। নমুনা সমীক্ষা (৮) অনুযায়ী ১৯৮২ আর ১৯৯৫য়ের মধ্যে পরিবারপিছু আই.আর.ডি.পি. ঋণ ভর্তুকির পরিমাণ ৬৩% কমে যায়। পঞ্চায়েত মারফৎ কর্মসংস্থান কার্যক্রম তহবিল থেকে দেওয়া পরিবারপিছু মজুরিও ১৫% হ্রাস পায়।

● ৮ নং সূত্রের নমুনা অঞ্চলে ১৯৮২ থেকে ১৯৯৫য়ের মধ্যে সরকারী সড়কের দৈর্ঘ্য বাড়ে মাত্র ৩%।

● ঐ সূত্রের নমুনা অঞ্চলে ১৯৮২ থেকে ১৯৯৫য়ের মধ্যে সরকারী খাল থেকে সেচ প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রফল বাড়ে মাত্র ১৭%।

কী করণীয়?

ভূমিহীন মানুষকে বললে হবে বড় শিল্প হোক তোমার ছেলে চাকরি পাবে? ক'জন দারোয়ান, পাচক আর পিয়ন নেবে টাটা সিঙ্গুরের কারখানায়? উন্নত চাকরি? কজনকে নিয়েছে ট্রেনিংয়ে?

ক'টা চাকরি হবে তো দেখলাম। ঐ একই কুমীরছানা ফের করে দেখানো হচ্ছে শহরের ছেলেমেয়েদেরও।

(১) ফলে তাঁর বাৎসরিক আয় অন্ততঃ একজন ক্ষেতমজুরের সমান। আস'লে এর চেয়ে বেশি। কতটা বেশি একটা আন্দাজ লাগানো যাক।

(২) আমাদের ছবিতে ক্ষেতমজুর কোনো না কোনো চাষীরই ক্ষেতে কাজ করছেন। প্রতি চাষী ক্ষেতমজুর রাখবেন না, কেউ অল্প সময়ের জন্য একাধিক মজুর লাগাতে পারেন, একই চাষী প্রয়োজনে মজুর লাগাচ্ছেন আবার অপরের ক্ষেতে মজুর খাটছেন, মাঝারি ও বড় চাষী সারা বছর মজুর রাখতে পারেন, বড় জোতের মজুর সংখ্যা একাধিক। এ রকম অনেক ব্যাপার আছে। সহজ করার খাতিরে আমরা ধরবঃ

(ক) গড়ে প্রতি চাষী পরিবার একজন মজুর রাখছেন, যদিও এ ব্যাপারে আছে প্রচুর অসমানতা। মজুর নেই এমন পরিবার যেমন আছে, একাধিক মজুর রাখেন এমন পরিবারও আছে। কিন্তু আমাদের হিসাব তো প্রতিরূপের জন্য।)

(খ) মজুরের কাজের ফলে অন্তত:পক্ষে মজুরির সমান উদ্বৃত্ত চাষীর ঘরে জমা হচ্ছে, যদিও তার চেয়ে কম হলেও চাষীকে মজুর রাখতে হতে পারে।

চাষীর খাইখরচা আমরা ক্ষেতমজুরের সমানই ধরব। সরকারী সমীক্ষায় গ্রামীণ শ্রমজীবি আর ক্ষেতমজুরের মধ্যে গড় খাইখরচে খুব তারতম্য পাওয়া যায় না (১২)।

তা হলে খুব মোটা হিসাবের জন্য আমরা ধরব শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে প্রত্যেক চাষী গড়ে একজন মজুরের সমান উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করবেন + ক্ষেতমজুরের মজুরির সমান বাড়তি উদ্বৃত্ত (=৭১ X ২৭১) যোগ হবে প্রতি চাষী পরিবারের মোট বাৎসরিক উদ্বৃত্তে।

চাষীর সংখ্যা আমরা নিচ্ছি ৫৬,৫৩,৯২২ (১১)। আর চাষী পরিবারের সংখ্যা নিচ্ছি পুরুষ চাষীর সংখ্যার সঙ্গে সমান, ৪৬,৫৫,২১০ (১১) তা হলে চাষীদের উদ্বৃত্ত দাঁড়াবে

এই সম্ভাবনা বাস্তবে কার্যকরী হলে জমি হারানো যেমন বন্ধ হবে, তেমনই একসঙ্গে বড় জমিখণ্ড চাষের ফলে কৃষি বেশি বেশি করে লাভজনক হয়ে উঠব। কৃষির শ্রীবৃদ্ধির ভবিষ্যত এই কো-অপারেটিভ চাষে।

চাষ যত লাভজনক হবে তত চাষের কাজ বাড়বে। গ্রামে হু হু করে বেকার তৈরি কমে যাবে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চাষীর হাতে পয়সা আসবে। কাপড়জামা, বিছানা বালিশ, তেলসাবান পাউডার চুলের ফিতে রিবন হেয়ারব্যাণ্ড, ছুরিকাঁচি চুলের কাঁটা, চেয়ারটেবিল, আয়না, লন্ঠন টর্চবাতি, ট্র্যানজিস্টর, সাইকেল, আর যদি বিদ্যুত পৌঁছায় তবে আলো পাখা টিভি, কত জিনিস কিনতে হবে, ছোট শিল্পই তো এ সবের যোগান দেবে যদি সরকার সুরক্ষা নীতি চালু করে বড় পুঁজি ও বিদেশি মালের প্রতিযোগিতা ঠেকিয়ে দেয়। ছোট শিল্প যত বাড়বে আমরা দেখেছি তত বাড়বে কর্মসংস্থান, শহরের বেকার সমস্যার গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া যাবে।

মোট কথা কৃষিতে গতি আনার অনেক সম্ভাবনা আছে, যথেষ্ট চেষ্টা না করেই, কী কী ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার ফলে কৃষিতে মন্থরতা দেখা দিচ্ছে সেগুলিকে অনুধাবন না করেই যেভাবে মুখে ভিত্তি বলে কাজে পরিত্যাগ করে বৃহৎ পুঁজির সোনার হরিণ ধাওয়া করা হচ্ছে তা এক প্রকারের চঞ্চলমতিত্ব যা বরং শিল্পের ভিত্তি যে চাহিদা তাকেই বাড়তে দিচ্ছে না, শিল্পের প্রসারকেই বাধা দিচ্ছে।

এইভাবে গ্রামে চাষের ক্রমাগত উন্নতি হলে ক্ষেতমজুরদের সারা বছর (যার সরকারী মানে বছরে ২৭১ দিন) কাজ থাকবে, তাঁদের মজুরিও তাঁরা বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

একবার খুব কম কম করে হিসাব করুন তো কৃষিতে এই নতুন জোয়ার এলে তার প্রথম ফল কী হবে?

গ্রামে লুকোনো আছে শিল্পায়নের বিশাল বাজার

ধরা যাক প্রতি ক্ষেতমজুর "সারা বছর" কাজ পাবেন দৈনিক ৭১ টাকা হারে (২০০৫ সালে সরকার স্থিরীকৃত ন্যূনতম মজুরি ছিল দিনে ৬৭.৪২ টাকা (১০))। যদি ধরি ৭৩,৬২,৯৫৭ ক্ষেতমজুরের সংখ্যা (১১) পঃ বাংলার ক্ষেতমজুরদের মোট বাৎসরিক আয় দাঁড়াবে ১৪১৬৭ কোটি টাকা। এ দিকে ক্ষেতমজুর পরিবারের গড় মাথাপিছু মাসিক খাইখরচ ধরি ৩৯১.৮৫ টাকা (১২)। খাইখরচের বিভিন্ন খাত হিসাবে ধরা হয়েছে খাবার (৬৯%), জামাকাপড়, বিছানা, জুতো, নেশার জিনিস, জ্বালানি ও আলো, বাড়িভাড়া, পরিষেবা ও অন্যান্য।

২০০০ থেকে ২০০৫'য়ের মধ্যে ক্ষেতমজুরদের পারিবারিক খাইখরচার মূল্য সূচক বেড়েছিল খাবারের ক্ষেত্রে ১.১২ গুণ এবং সাধারণ দ্রব্যে ১.১৫ গুণ (১১)। এই হিসাবে মাথাপিছু মাসিক খাইখরচা বাড়িয়ে ধরা হল ৪৪২.৪০ টাকা।

যদি ধরি ৫০,৮০,২৩৬ পুরুষ ক্ষেতমজুরের(১১) প্রত্যেকের গড়ে ৪.৬৮ জন সদস্যের (১২) পরিবার আছে তাহলে পঃ বাংলার ক্ষেতমজুরদের মোট বাৎসরিক খাইখরচ হবে ১২৬২২ কোটি টাকা।(বেশিই ধরা হল, কারণ একই পরিবারের একাধিক পুরুষ মজুর খাটতে পারেন।)

বছরে ক্ষেতমজুরদের হাতে আসবে উদ্বৃত্ত ১৫৪৫ কোটি টাকা।

বলা হতে পারে এর জন্য কৃষিতে নতুন জোয়ার আনার কী আছে। সরকারী এন.আর.ই.জি. প্রকল্প চালু রাখলেই ক্ষেতমজুর কাজ পাবেন।

এন.আর.ই.জি. তো সেই জি.আর., টি.আর.'য়ের নয়া সংস্করণ। কিছু নিম্ন মানের পরিকাঠামো তৈরির নামে ক্ষেতমজুরদের জন্য খয়রাতি। আয়ের পরিপূরক হিসাবে এন.আর.ই.জি. অবশ্যই কাম্য। কিন্তু আমরা ক্ষেতমজুরের হাতে কাজ বাড়ার প্রধান কারণ হিসাবে দেখতে চাই চাষীর শ্রীবৃদ্ধি। বাস্তবে শ্রীবৃদ্ধি হবে এক জটিল প্রক্রিয়া। চাষী ও ক্ষেতমজুরের বর্তমান অনুপাত পালটে যাবে, কো-অপারেটিভ হলে চাষ ও চাষকে ঘিরে উৎপাদন সম্পর্কগুলো সব বদলে যাবে, আমাদের এই হিসাব অর্থহীন হ'য়ে যাবে।।

সেই ভবিষ্যতকে হুবহু মেলাবার চেষ্টা না করে এই শ্রীবৃদ্ধির প্রথম ধাপকে সংখ্যায় ধরার জন্য আমরা একটা প্রতিরূপ, একটা মডেল খাড়া করছি -- চাষীর উদ্বৃত্ত আমরা মাপছি তার নিজের পরিশ্রম + একজন ক্ষেতমজুরের পরিশ্রমের ফল হিসাবে, যেন শ্রীবৃদ্ধির ফ'লে গড়ে প্রত্যেক চাষী 'সারা বছর' একজন মজুর নিয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন এবং (তাই) প্রত্যেক ক্ষেতমজুরের 'সারা 'বছর' কাজ থাকবে।

হিসাবটা করতে থাকি।

চাষীদের বেলায় কার্যকরী উদ্বৃত্ত বার করতে গেলে চাষের খরচ জানতে হবে। চাষের ধরণ আবার জোতের মাপের সঙ্গে পাল্টাবে। তার উপর আছে ধান, পাট ও অন্য ফসলের তারতম্যের ব্যাপার। এত কাণ্ড না করে একটা সহজ যুক্তি খাড়া করে মোদ্দা হিসাবটা করে ফেলি। যদি ক্ষেতমজুরের চেয়ে চাষীর আয় কম হত তাহলে সে চাষ না করে মজুর খাটত।

১৪,১৮৫টি শাখা, ৪৭ হাজার কর্মচারী। ৪০ লাখ টন খাবার সরবরাহ চলে রোজ। (১৫)

ভেনিজুয়েলা একটা দেশ যাকে ৭৫% খাবার আমদানি করতে হয়। তার কারণ জমির ৭৫% জনসংখ্যার ৫%য়ের হাতে। এই বড় জমিদাররা হয় খাদ্য উৎপাদন করবে না, নইলে করবে কেবল রপ্তানির জন্য। (১৫)

মারকাল ৪০% জিনিস কেনে স্থানীয় ও আঞ্চলিক উৎপাদকদের থেকে। স্থানীয় কৃষিভিত্তিক শিল্পে মারকাল ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায় কর্মসংস্থান বাড়াচ্ছে, এই ব্যবসাগুলির প্রসার ঘটছে। তারা জাতীয় অর্থনীতিতে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে। সরাসরি স্থানীয় ক্রয় ব্যবস্থার ফলে মালবহন, সরবরাহ ও বিজ্ঞাপনের খাতে খরচ কম হয়, ভোক্তাকে কম দামে জিনিস দেওয়া যায়, সরকারি ভর্তুকিও হ্রাস পায়। (১৫)

ভেনিজুয়েলা দেশটিও মাটির। সেখানেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই চলছে। খালি দেশিবিদেশি হাঙরদের তারা চেনে। বড় বিনিয়োগ নিয়ে তাদের মোহ নেই কারণ বড় বিনিয়োগের ফল তারা জানে। আমরা জানি না, তাই মোহগ্রস্ত। বিনিয়োগের পরিমাণ শুনেই আমাদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে চিন্তাশক্তি লোপ পায়, আমরা ভ্যাবলা হয়ে যাই।। বিনিয়োগের ফল নিয়ে কিছু শুনতে রাজি হই না। আমাদের তাই কাগজে পড়তে হবে কোটি টাকার উপাখ্যান আর কানে আসতেই থাকবে বেকারত্বের আর্তনাদ।

সূত্রঃ

(১)মোহন গুরুস্বামী, কমল শর্মা, জীবন প্রকাশ মহান্তি, টমাস যে কোরা, এফডিআই ইন ইণ্ডিয়াস রিটেল সেক্টর, সেন্টার ফর পলিসি অল্টারনেটিভস, ২০০৭।

(২)ওয়েস্ট বেঙ্গল হিয়ুমান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৪।

১১৮৬+৮৯৫৭= ১০,১৪৩ কোটি টাকা। ক্ষেতমজুরদের উদ্বৃত্তের সঙ্গে মিলালে মোট বাড়তি উদ্বৃত্ত পাব ১১,৬৮৮ কোটি টাকা। কিন্তু জনসংখ্যার হিসাব তো ২০০০-২০০১ সালের। মজুরি আর দাম ২০০5 সালের। এখন এই ৪-৫ বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা আর চাষীর সংখ্যা কী দাঁড়িয়েছে? ১৯৯১-২০০১ পঃ বাংলার জনসংখ্যা বেড়েছিল ১.১৭৭ গুণ, বছরপ্রতি ১.০১৬৫ গুণ(২)। তাহলে ৫ বছরে জনসংখ্যা ১.০৮৫ গুণ বেড়েছে। এখন ক্ষেতমজুর সংখ্যা ১৯৯১-২০০১ এই ১০ বছরে বেড়েছে ১.২৬ গুণ (৭)। কিন্তু প্রধান শাসক দল এই হিসাব মানেন না। তাঁদের বক্তব্য এই হিসাবে বর্গাদারদেরও ধরা হয়েছে। ২ নং সূত্রে তাই সমস্ত শ্রমজীবিদের অনুপাতে পুরুষ ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়ে নি দাবি করা হয়েছে, চাষীদের সংখ্যা তো কমেইছে। এই বিতর্কে না ঢুকে আমরা আর ৫ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোনো সংশোধন করলাম না।

২০০৪-০৫ সালে রাজ্যের নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন এস.ডি.পি.র মধ্যে নথিভুক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের দান ছিল ৬১৮৯ কোটি টাকা (এটি ১৯৯৩-৯৪ সালের মূল্যমান অনুযায়ী দ্রুত হিসাব। চালু মূল্যমানে এই হিসাব দেয় ৭২৩৪ কোটি টাকা)। (১১) মানে, কৃষির যদি এইটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয় যে ক্ষেতমজুররা চাষের কাজেই বছরে ২৭১ দিন ন্যূনতম মজুরিতে কাজ পান তা হলে গ্রামের মানুষের হাতে ১১,৬৮৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত জমা হবে বছরে, যা হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস সহ রাজ্যের পুরো নথিভুক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে এস.ডি.পি.র দেড় গুণের বেশি।

এই উদ্বৃত্ত ছোট শিল্পের জন্য খুলে দেবে এক সুনিশ্চিত বাজার। আন্দাজ ৯৭ লাখ চাষী ও ক্ষেতমজুর পরিবার পিছু ১২,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হবে বছরে। তাই দিয়ে তাঁরা পণ্যদ্রব্য কিনবেন। সরকারকে একটা বন্টন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বিশেষ করে গ্রামের

বাজারের জন্য তৈরি (ছোট শিল্পের)মাল কৃষকের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে, বেশি হাত না ঘুরে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প ও খুচরো ব্যবসাঃ বড় পুঁজির আক্রমণ

আমরা দেখেছি গ্রামের মানুষকে কৃষির বাইরে তাকাতেই হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সব চেয়ে স্বাভাবিক ব্যবসা ও শিল্প কৃষিভিত্তিক। ধানকল আর ঠাণ্ডাঘর দিয়ে শুরু হয়েছিল এই ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ। খাবার বিপণন ও প্রোসেসিং নিয়ে সরকারী ক্রিয়া ছিল, সক্রিয়তা তেমন নজর কাড়ে নি। এবার এই ক্ষেত্রে সরকার তুমুল আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ২ কোটি ডলার বেসরকারী বিনিয়োগের ভিত্তিতে ৬ টি ফুড পার্ক হচ্ছে। ৪.৭ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে ৮ টি কৃষিদ্রব্য রপ্তানি অঞ্চল বসেছে। চায়ের জন্য আর একটি বসবে। এই বিনিয়োগের ৭২% বেসরকারী।(১৪)

কেমন কোম্পানি এখানে ব্যবসা খুলছে?

বৃহৎ জার্মান কোম্পানি মেট্রোকে পঃবাংলা ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে জমি দেওয়ার কথা রয়েছে। তারা ২০ কোটি টাকা দিয়ে কাঁচা ফল সব্জি মাছ মাংস সরবরাহ করার ব্যবসা খুলবে।(১৪)

মার্কিন দৈত্য পেপসিকো কোম্পানি তার ফ্রিটো-লে শাখার মাধ্যমে ঠাণ্ডাঘর থেকে শুরু করে আলু প্রোসেসিং শিল্পে থাবা বসাচ্ছে।

জাপানের মিৎসুবিশি ও হিন্দুস্থান লিভার মিলে ডানকুনির মডিউলার ফুড পার্কে ঠাণ্ডাঘর প্রকল্প চালু করেছে।

ডেল মন্ট প্যাসিফিক ১.১ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে আম ও আনারস ব্যবসায়।(১৩)

এ ছাড়া খুব সম্প্রতি খুচরো ব্যবসায় পঃ বাংলা সরকার বৃহৎ পুঁজিকে ডেকে আনছে - রিলায়েন্স, ওয়াল মার্ট(বিদেশি)।

কলকাতার পার্ক সার্কাস বাজারটাকেই তুলে দিতে চাচ্ছে বৃহৎ পুঁজির হাতে। দোকানদারদের প্রবল প্রতিবাদে এই চক্রান্ত একটু থমকে দাঁড়িয়েছে।

কর্মসংস্থান? কেউই বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। তবে একটা উদাহরণ থেকে এই ক্ষেত্রে চাকরির ভবিষ্যত আঁচ করা যায়। মেট্রো কোং ২০০ কোটি টাকায় ৯০০ চাকরি জোগাবে (১৪), অন্ততঃ এখনও তাই বলছে। ২২ লাখ টাকায় এক একটি চাকরি। আর ভাবুন তো কাঁচা আনাজ থেকে শুরু করে আলুভাজা, টিনে আম আনারস, জেলি আর আচার, যদি অসংখ্য যে ছোট ব্যবসায়ী আর ফেরিওয়ালা এখন এই শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁদের এই বড় দেশিবিদেশি হাঙরদের মুখে ফেলে নির্মূল না করে তাঁদেরই সরকারী উদ্যোগে সংগঠিত করলে অগণিত পরিবারের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়ার বদলে অনেক কম বিনিয়োগে কত বেশি কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা যেত।

বিদ্যুত, ঠাণ্ডাঘর, রাস্তাঘাট, জমিজমার যে পরিকাঠামো সরকার বড় পুঁজিকে উপহার দিচ্ছেন তা যদি এই সাহসী, কর্মোদ্যোগী মানুষগুলোর মত করে সাজাতেন? হ্যাঁ কোটি ডলারে বিনিয়োগ, তার মুনাফা আর কাট মানি, প্রচারের ঢক্কানিনাদ থাকত না। কিন্তু চাকরি শ'য়ে গুণতে হত না, হাজারে, দশ হাজারে গোণা যেত।

মেঠো বক্তৃতা মনে হচ্ছে? চলুন যাই ভেনিজুয়েলা। ডিসেম্বর ২০০2 থেকে জানুয়ারি ২০০৩, বিদেশি তেল শিল্প লক আউট, অন্তর্ঘাত চালিয়ে খাবারের ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল। তখন সরকার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে খাবার সরবরাহ ব্যবস্থা গড়তে শুরু করে। এপ্রিল ২০০৩য়ে ৩ টি দোকান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে মার্কাদো দ্য আলিমেন্তস, মার্কাল খাদ্য বিপণী। এখন তার

বাঁধ (যেমন নর্মদা সাগর প্রকল্প) নির্মাণের জন্য । এই আইনের ভিত্তি হল "এমিনেন্ট ডমেন" তত্ব। এই তত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রকে যেহেতু প্রায়ই নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে সরকার, তাই জমির ক্ষেত্রে কার্যতঃ এই তত্ব জমির উপর কৃষকের মালিকানার নিঃশর্ত অধিকারকে অস্বীকার করে, সরকার জমি চাইলে কৃষক যে না বলতে পারে সেই অধিকারকে মানে না। বৃটিশ সরকার তার ভারতীয় প্রজাদের অধিকারকে এই চোখে দেখতো তা বলাই বাহুল্য। পরিতাপের বিষয় সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও আমাদের এই তত্ত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তি নেই।

কিন্তু মানুষও থেমে থাকে নি। গোবিন্দপুর রেল কলোনি, সিঙ্গুর, কলিঙ্গনগর থেকে নর্মদা অববাহিকা, সর্বত্রই ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করার যে অধিকার সরকার ঘোষণা করেছে মানুষ তাকে অস্বীকার করেছে। ভারত একটি সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র মানে ভারতের নাগরিকদেরই আছে সার্বভৌম ক্ষমতা। নাগরিকদের প্রতিভূ হিসাবে কিছু বিশেষ কার্যনির্বাহের জন্য আছে সরকার। নাগরিকদের সংখ্যাগুরু ভোটে নির্বাচিত হয়েছে বলেই সরকার নাগরিকের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। অপর কোনো আইনের পরিপন্থী না হলে সরকার নির্ধারিত কোনো "সাধারণের স্বার্থে"র নাম করে যে ভূমিতে নাগরিক সার্বভৌম সেই ভূমি থেকেই তাকে উৎখাত করার অধিকার সরকারেরও নেই।

"এমিনেন্ট ডমেন" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হরদম ব্যবহৃত হয়, অনেক সময়েই প্রমোটারদের স্বার্থে। ঠিক সিঙ্গুরের মত সরকার 'সাধারণের স্বার্থে' জমি অধিগ্রহণ করে তুলে দেয় বেসরকারী হাতে। "এমিনেন্ট ডমেন" জাতীয় ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে মার্কিন মানুষ সরব হচ্ছেন। তাঁরা প্রতিরোধ সংগঠন গড়ে তুলছেন যাতে

(৩) ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩রা মে, ২০০৭।

(৪)অনির্বাণ দাশগুপ্ত, অ্যাগ্র্যারিয়ান রিফর্মস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিন্স ১৯৭৭ঃ এ ক্লোসার লুক অ্যাট দি অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস, অর্থনীতি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া, রিভারসাইড, ২০০৫।

(৫)বাজেট বক্তৃতা, অসীম দাশগুপ্ত, ২০০৭-০৮।

(৬)অনিল চক্রবর্তী (অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায় ও দেবেশ রায়ের সঙ্গে), বেনিফিশারিস অফ ল্যাণ্ড রিফর্মসঃ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনারিও, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েতস এ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ২০০৩।

(৭)ভারতের জনগণনা, ১৯৯১,২০০১।

(৮)প্রণব বর্দ্ধন ও দিলীপ মুখার্জি, ল্যাণ্ড রিফর্মস, ডিসেন্ট্রালাইসড গাভার্নেন্স অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেংগল, স্ট্যানফোর্ড সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স, মে ৩১-জুন ৩, ২০০৬।

(৯)অজিতাভ রায়চৌধুরী, লেসনস ফ্রম দ্য ল্যাণ্ড রিফর্ম মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইণ্ডিয়া, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শাংহাই'তে, মে ২৭-২৮, ২০০৪।

(১০)শ্রম বিভাগ, পঃ বাংলা সরকার, সংগৃহীত - পেচেক.ইন, ইন্টারনেট, ১.৮.২০০৭।

(১১)স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, ২০০৫, ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্বের ব্যুরো, পঃ বঙ্গ সরকার।

(১২)৫৫তম এন.এস.এস. রাউণ্ড, ১৯৯৯-২০০০।

(১৩)পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপস ইন ইণ্ডিয়া, ১.০৪.২০০৭, অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার।

(১৪)ডি-ডব্লু.ডিই, ইন্টারনেট, ১২.১১.২০০৫।

(১৫)ভেনিজুয়েলা ফুড প্রোগ্রাম, গ্রীন লেফট উইকলী, ১২.০৭.২০০৫ (ইন্টারনেট)।

চতুর্থ অধ্যায়
সরকার নয়, দেশের মানুষই সার্বভৌম

ছোট শিল্পের জন্যও জমি লাগবে তবে তা সারা রাজ্যে ছড়ানো ছেটানো থাকবে ফলে বড় জনপদ উৎখাত করতে হবে না। তবু জমি লাগবে। আর নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বসবে। বাজার হবে, সড়ক হবে। সেচের খাল হবে। কিছু জমি মানুষের কাছে চাইতে হবে। মোদ্দা কথাটা এখানেই, চাইতে হবে। কেড়ে নিলে হবে না। স্বভাবতই চাইলে তো দেখতেই হবে পরিবর্তে কী পেলে দাতা সন্তুষ্ট হবেন। এটি জোরজবরদস্তির প্রশ্ন নয়, আলাপ আলোচনার প্রশ্ন।

আমাদের রাজ্যে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সুতরাং রাজ্য সরকারের কাছে পুরোটাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন। আসলে এটা মানুষের 'না' বলবার অধিকারের প্রশ্ন, নাগরিকের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। কী ভাবে পুনর্বসিত হলে 'হ্যাঁ' বলবেন মানুষ তার প্রশ্ন।

বিকল্প পথের ৪ নং দিকনির্দেশ
ফ্যাসিবাদী চাপ নয়, মানুষের মত নিয়ে কাজ

১৮৯৪ সালে বৃটিশের করা জমি অধিগ্রহণ আইনবলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করছেন পরিকাঠামো (রাস্তাঘাট, রেললাইন, ব্রিজ), শিল্প (যেমন সিঙ্গুর), সেচের কাজে বিরাটকায়

আর ক্ষতিপূরণের পয়সা হাতে দিয়ে, "যাও এবার বুঝে নাও' বললে চলবে না। উৎপাটিত হচ্ছে কয়েকজন ব্যক্তি নয়, একটা জনপদ। এই জনপদকে একত্র রেখে পুনর্বসিত করতে হবে। তার জন্য যে জায়গাজমি তা সরকারকেই আগে থেকে জোগাড় করে রাখতে হবে। ক্ষতিপূরণ নয়, পুনর্বাসন। পুনর্বাসন আগে, অধিগ্রহণ পরে।

● আর পুনর্বাসনের পরিকল্পনা অধিগ্রহণের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই জানাতে হবে এবং গ্রামসভা বা বস্তি/মহল্লা কমিটি স্তরে মানুষ প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুমোদন করলে তবেই অধিগ্রহণের দিকে সরকার এগোবে। তার পরেও প্রতি পদক্ষেপ নিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে ।

রক্ষাকবচ খুব বেশি মনে হ'চ্ছে? নিজেকে একবার ফেলুন একজন গরীব চাষীর অবস্থায়। তার জমিটুকু কেড়ে নিয়ে কিছু টাকা হাতে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রীপুত্রকন্যার হাত ধরে সে রাস্তায়। কেমন লাগতো আপনার?

অসম্মতির অধিকার

অসম্মতির অধিকার আসছে নাগরিকের সার্বভৌমত্ব থেকে। যেহেতু ভারত সাধারণতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের ওই গরীব চাষীটিও অংশীদার তাই তার সম্মতি বিনা তাকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

এখান থেকেই আসছে পুনর্বাসনের প্রশ্ন -- তাকে এমন একটি বিকল্প দেওয়া যেটি তার বর্তমান অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, বরং উন্নীত করবে।

ভুক্তভোগীদের আর একা একা মামলা লড়তে বা প্রচার চালাতে না হয়। সক্রিয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আছে দি ইনস্টিটিউট ফর জাস্টিস, সিটিজেনস অ্যাগেনস্ট এমিনেন্ট ডমেন অ্যাবিউস'এর মতো নাগরিক সংগঠন ও গ্রীন পার্টির বিভিন্ন শাখা। মার্কিন জনমত এত সোচ্চার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে যে এক একটি স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ভার্জিনিয়া ও ক্যালিফর্নিয়ার মত রাজ্যের সংসদও "এমিনেন্ট ডমেন"য়ের ঢালাও প্রয়োগ আটকানোর জন্য আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লির গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক "জাতীয় পুনর্বাসন পলিসি-২০০৬" নামে একটি খসড়া তৈরি করেছে। মন্ত্রীর কাছে খসড়াটির প্রভূত পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সুপারিশ পাঠিয়েছে দিল্লি, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের নানা সংগঠন। এদের মধ্যে আছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, মৎস্যশ্রমিকদের ফোরাম, জঙ্গলের মানুষ ও জঙ্গলের শ্রমিকদের জাতীয় ফোরাম। অনেকেই যুক্ত মানুষের আন্দোলনের জাতীয় জোট এন.এ.পি.এম.'য়ের সঙ্গে।

বস্তুতঃ ১৯৯৮ নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারী সংগঠনগুলির নানা সুপারিশ গ্রহণ একটি খসড়া তৈরি করে। তারপর বিজেপি সরকার এসে সব আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় এমন অপর একটি খসড়া নিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমান খসড়া এরই কাছাকাছি। ইতিমধ্যে বেসরকারী সংগঠনগুলির সুপারিশগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় পরমর্শদাতা পরিষদ 'জাতীয় উন্নয়ন, অপসারণ ও পুনর্বাসন নীতি' নামে একটি খসড়া তৈরি করে (ডিসেম্বর, ২০০৫)। সেইটিকে চেপে দিয়ে ২০০৬'য়ের সরকারী খসড়া আনা হ'য়েছে। আমরা এবার
(ক)২০০৫ সালের খসড়া 'নীতি' এবং

(খ) বিভিন্ন সংগঠন ২০০৬ সালের সরকারী প্রস্তাবের যে লিখিত সমালোচনা করেছেন সেই দলিলগুলির
ভিত্তিতে (১) আলোচনা শুরু করব।

- মৌলিক দাবি অবশ্যই জমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন, যাতে এটি মানুষের উপর রাষ্ট্রের "এমিনেন্ট ডমেন" মারফৎ জোরজবরদস্তির হাতিয়ারের বদলে মানুষের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষার একটি কবচ হয়ে উঠতে পারে।

এই আইনকে আনতে হবে সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদ থেকে, কারণ বাঁচার অধিকার অবশ্যই নিয়ে আসে বাঁচার উপকরণ সংরক্ষণের অধিকার - রুজি, আশ্রয়, বাসস্থানের অধিকার।

- যে "সাধারণের স্বার্থ" দেখিয়ে জমি কাড়া হয়ে গেল, সেটি যে কী বর্তমান আইনে তা প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা নেই। সর্বোপরি অধিগ্রহনের ফলে সাধারণের মঙ্গল ঘটছে কি না তাই নিয়ে আদালতে যাওয়া নিষিদ্ধ করা আছে।

দাবি, প্রতি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে "সাধারণের স্বার্থ"টি কী, এবং ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হলে মানুষ আদালতে মামলা রুজু করতে পারবেন।

- বর্তমান আইন ধরেই নেয় যে মানুষকে উৎখাত করা হবে। উচিত, উৎখাত না করে, বা ন্যূনতম সংখ্যাকে উৎখাত করে কী করে কাজটা হতে পারে তার সমস্ত রকম চেষ্টা চালানো।

- ঔপনিবেশিক আইনটিতে স্বভাবতই কোনো আপত্তি বা অসম্মতির জায়গা নেই। অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি হল ব্যাস। মানতে হবে, নইলে আসবে রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী। পুলিশ, মিলিটারি বড় পুঁজির স্বার্থরক্ষায় আসবে এতে আর কী বলার আছে। পঃ বাংলায় নতুন

দেখা যাচ্ছে প্রতিবাদ থামাতে বড় পুঁজির হয়ে আসছে দলের সশস্ত্র বাহিনী।

- উৎখাত হওয়া মানুষকে খালি জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তা'ও অর্থে, এবং জমিবিক্রির পুরানো নথি অনুযায়ী।

বর্তমান আইনে রুজি, মাথার ছাত, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ব্যবহার, বাসস্থানের এলাকার প্রকৃতি, বাঁচার এই সব মৌলিক শর্তের বিলুপ্তির জন্য ক্ষতিপূরণ নেই। তাই জমির মালিক বাদে সিঙ্গুরে অন্য কারো জন্য ক্ষতিপূরণের কথা প্রথমে ভাবে নি সরকার। আন্দোলন শুরু হতে তবে ভাগচাষীদের ক্ষতিপূরণের অধিকার (পূর্ণ মালিকানার ২৫% হারে) স্বীকৃত হয়। ক্ষেতমজুরদের কী হবে? কুমোর, কামারের মত হস্তশিল্পীদের? দোকানদারদের?

তাই দাবি, কেবল জমির মালিক নয়, যাঁদেরই সম্পত্তি, আয় রুজি, বা আশ্রয় অন্ততঃ ৫০% ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাঁদেরই "ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ" হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

দাবি, অধিগ্রহণের ফলে যে সম্পত্তি বা রুজি, জীবনধারণের নানা যে সম্পদ মানুষ হারাচ্ছেন সে সমস্ত কিছুরই পুনর্স্থাপনা মূল্য দিতে হ'বে, এবং বর্তমানের বাজারদর অনুসারে।

ক্ষতিপূরণের বা বলা ভাল পুনর্স্থাপনার নীতি কী হবে? দাবি, চাষীকে "জমির জন্য জমি" দিতে হবে। অন্যদের ২ বছরের আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এবং অধিগৃহীত এলাকায় কর্মসংস্থানে তাঁদের থাকবে প্রথম অধিকার। দরকার মত মানুষকে সাক্ষর করতে হবে, ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে। দোকানদারকে দোকান করে দিতে হবে।

সূত্রঃ

(১)দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এস.ই.জেড. বিল, ২০০৩।

(২)প্রসেনজিৎ বোস, দ্য মার্ক্সিস্ট, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬।

(৩)প্রমেশ নায়ার ও ব্রাইট সিং, এস.ই.জেড. ড্রাইভ ইন গুজরাট, গভর্নমেন্ট অফ গুজরাট এ.এম.এ. সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, মে ২০০৬।

(৪)রাহুল গুপ্ত ও ঈশিতা মুখার্জি, স্কোপ অফ কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দি আর্লি ২০০০, ৩রা জুন, ২০০৬, সোশাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ই-লাইব্রেরি)।

(৫)ছোট মাপের শিল্প মন্ত্রক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৪-৫ (উদ্ধৃত -- ৪)।

(৬)স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, পঃ বঙ্গ সরকার, বিভিন্ন সংখ্যা (উদ্ধৃত -- ৪)।

(৭)ওয়েস্ট বেঙ্গল হিয়ুমান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৪।

(৮)অনির্বাণ দাশগুপ্ত, অ্যাগ্র্যারিয়ান রিফর্মস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিন্স ১৯৭৭ঃ এ ক্লোসার লুক অ্যাট দি অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস, অর্থনীতি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া, রিভারসাইড, ২০০৫।

দাবি, সংসদ কর্তৃক একটি জাতীয় পুনর্বাসন কমিশন স্থাপন, যার ছাড়পত্র ছাড়া মানুষ অপসারিত হতে পারেন এমন কোনো প্রকল্প অগ্রসর হতে পারবে না।

- অধিগ্রহণ "সাধারণের" যে "স্বার্থে" করা হচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত আশা করা যায় সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে। যে মানুষগুলিকে উৎখাত করে এই উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে তাঁদের জীবনযাত্রার মান পড়ে যাবে, এটা ন্যায়বিচার নয়। পুনর্বাসন তাই এমন হতে হবে যে তাঁদের জীবন যাত্রার মানও উঠতে থাকে।

- আর এটা বুঝলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ স্বেচ্ছায় অধিগ্রহণ মেনে নেবেন। নন্দীগ্রাম ঘটবে না।

সম্মতির প্রশ্নটি মৌলিক। এটি গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। জোরজবরদস্তি করে মানুষকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎখাত করার যে প্রবণতা দেখা গেছে কলিঙ্গনগরে, সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে (হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি স্মরণীয়, স্মরণীয় নন্দীগ্রামে চাষীরা জমি দিতে না চাইলে তাদের কী করা হবে সে সম্পর্কে প্রধান শাসক দলের বর্ষীয়ান নেতার বক্তৃতা), তা উদ্বেগজনক। এই প্রবণতা অবশ্যই প্রধান শাসক দল বড় পুঁজিনির্ভর কর্মসংস্থানবিমুখ যে অদ্ভুত 'শিল্পায়ন' নীতি গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে জড়িত। কেন না বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বড় পুঁজি ফ্যাসীবাদী কায়দায় সহজে কাজ হাসিল করতে চায়।

যে ভাবে মেকি 'শিল্পায়নের' স্লোগান তুলে বড় পুঁজি তাদের আগ্রাসনের বিরোধী মানুষকে শিল্পায়নবিরোধী বলে একঘরে করতে চাইছে তা ফ্যাসীবাদের দিকে একটা নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। আমাদেরও বড় পুঁজির চক্রান্তকে বুঝতে হবে। তার জন্য বুঝতে হবে মেকি 'শিল্পায়নের' স্বরূপ। বুঝতে হবে কেন বড় পুঁজিনির্ভর 'শিল্পায়ন' মানুষের হাতে কাজ দিতে পারবে না।

সামনে আনতে হবে শিল্পায়নের বিকল্প পথ, যে পথে চললে পরেই হাতে হাতে আসতে পারে কাজ। আর তার জন্য চাই লাগাতার মুক্তমনা আলোচনা।

সূত্রঃ

(১) জাতীয় উন্নয়ন, অপসারণ ও পুনর্বাসন নীতির খসড়া, ২০০৫;
জাতীয় পুনর্বাসন নীতি - ২০০৬, মন্তব্য ও বক্তব্য, দিল্লি ফোরাম সহ অন্যান্য সংগঠন;
জাতীয় পুনর্বাসন নীতি - ২০০৬, একটি পর্যালোচনা, এন.সি.এ.এস., পুনে;
খসড়া জাতীয় পুনর্বাসন নীতি - ২০০৬'য়ের একটি মূল্যায়ন, এন.এ.পি.এম. ও অন্যান্য সংগঠন।

উপসংহার

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই দেশিবিদেশি বেসরকারী বড় পুঁজির উপর না নির্ভর করে কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নের সম্ভাবনার কিছু দিকনির্দেশ আলোচিত হল। কিন্তু বড় পুঁজি ছাড়বে কেন? বেশি মুনাফার জন্য সে তার কর্মসংস্থানবিমুখ, পুঁজিনির্ভর বিনিয়োগ চালিয়ে যেতেই চাইবে। বিকল্প পথে চলতে গেলে দেশি বিদেশি বড় পুঁজির সঙ্গে কঠোর রাজনৈতিক লড়াই ছাড়া এক পা'ও এগোনো যাবে না। কোনো সরকার দাক্ষিণ্য দেখাবে না। প্রতি ইঞ্চি আদায় করে নিতে হবে।